Book Fair Issue
2005

বইমেলা সংখ্যা
২০০৫

অনুদান ঃ ৫ টাকা

স্বকণ্ঠে
in her own voice

A
Sappho Publication

একটি
'স্যাফো' প্রকাশনা

শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বিতরণের জন্য

A support group for Lesbian, Bisexual & Transgendered women in Eastern India

আমাদের কথা

আবার বইমেলা। আবারও আমরা। 'স্যাফো'র মেয়েরা। দীর্ঘ এক বছর প্রবাসের পর ঘরে ফেরা। প্রাথমিক কুশল বিনিময়, তারপর খোঁজখবর — কেউ কেউ ছেড়ে গেছে — কে যেন পৃথিবীর আলো প্রথম দেখলো! না, সালতামামি এ নয়। এই পত্রিকার প্রকাশ — আরও একবার বাজিয়ে দেখে নেওয়া — জড়িয়ে যায়নি তো তারে তারে? ঝঙ্কার উঠছে তো ঠিকমত, আজও? এ কেবল অঙ্গীকারের দলিলে বিশ্বাসের শিলমোহর। তাই যখন শুনি দুটি মেয়ে পরস্পরকে ভালবেসে ভেসে গেছে মৃত্যুর স্রোতে, স্বেচ্ছায়, অকালে, বুকের অতল গভীরে ফাটল ধরে, ভেঙে যাওয়ার চিহ্ন হিসেবে নয় — ভাঙন ধরানো অন্য এক সুনামির জন্মবীজ। আছড়ে পড়ে প্রশ্ন — উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গে যে সমকামী মেয়েরা যুগলে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয় মাত্রই তিন চার মাস আগে, তাদেরকে বেঁচে থাকার একটু জায়গা দিলে খুব কি ক্ষতি হত সমাজের? আফশোস কুরে কুরে খায় — ইস্, তাদের যাবার আগে যদি পৌঁছানো যেত তাদের কাছে!

ঢেউ ওঠে, কিন্তু ধ্বংসলীলায় মাতে না — কারণ আমরা সহিষ্ণু, ধৈর্যশীল। সে ঢেউ ধারণ করি অন্তরে। ভিতরের উদ্‌গীরণ বাইরে এসে কঠিন হয় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ক্ষত বিক্ষত ক'রে জমে যাওয়া লাভা স্রোতের মত। আগুন নেভেনা ভিতরে। ধিকিধিকি জ্বলতে থাকে। সেই আগুনে শুদ্ধ হয়েই আর দুই জোড়া মেয়ে আবদ্ধ হয় তথাকথিত "সমাজ-অস্বীকৃত" বিবাহ বন্ধনে, অমৃতসরে ও বিহারে। আর আমাদের পশ্চিম বাংলার মেয়েরা অসীম আত্মবিশ্বাসে এগিয়ে এসে কলম ধ'রে নিজেদের সমপ্রেমের আখ্যান লিপিবদ্ধ করে, বুঝে নিতে চায় শুধুমাত্র একজন মানুষ হিসেবে এই পৃথিবীতে, এই সংসারে তাদের মূল্য। ওদের আত্মকথন ব'য়ে প্রকাশিত সে বই-এর ঠিকানা মিলবে এই মেলা প্রাঙ্গণেই।

এই যে এক পৃথিবী দেশ, এক দেশ মানুষ, এক মানুষ ভর্তি ভালোবাসা, প্রেম — সে তো তার একান্ত নিজস্ব। একান্তই ব্যক্তিগত তার যৌনতাবোধ। এই যৌনতাবোধেরই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ সমকাম ও বিসমকাম। বিসমকাম সমকামের মতই স্বাভাবিক ঠিক যেমন সমকাম বিসমকামের মত। একজন বিসমকামী যেমন কেবল তাঁর যৌনতা দিয়ে সমাজে পরিচিত হন না, একজন সমকামী কেনই বা শুধুমাত্র তাঁর ভিন্নতর যৌনতা দিয়ে চিহ্নিত হবেন? কেনই বা পরিগণিত হবেন এক মনুষ্যেতর প্রজাতি হিসেবে, বঞ্চিত হবেন একজন মানুষ হিসেবে সমস্ত অধিকার থেকে? কেনই বা শিকার হবেন অসাম্যের যেমনটি হয়েছে শ্রীলঙ্কার উপকূলবর্তী প্রাকৃতিক সুনামি বিধ্বস্ত গ্রাম ও শহরগুলির ত্রাণশিবিরে? কেন ছিঁড়ে ফেলা হবে মানবিক অধিকার আদায়ে সমাজকে সচেতন করার সমস্ত নথিপত্র অশ্লীলতার দায়ে, ঠিক যেমন করা হয়েছে রিষড়া মেলায় চন্দননগরের 'আমিতিয়ে' দলটির সঙ্গে?

নিরন্তর অ-সুখে কোন মানুষই থাকে না। সুখের ঝিলিক আমাদেরও ছুঁয়ে যায় যখন দেখি বিগত বছরে তাকিয়ে। আমরা সমর্থ হয়েছি আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে ইতিহাস রেখে যেতে। 'স্যাফো'র জন্ম, বিবর্তন, কর্মপদ্ধতি ও আন্দোলনের ধারা আজ নথিবদ্ধ একটি গবেষণাপত্রে। ধন্যবাদ Sarai, Centre for Study of Developing Societies (New Delhi), আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে, আর্থিক সাহায্যে আমাদের গবেষণা সফল করার জন্যে। ধন্যবাদার্হ তরুণ প্রজন্মের সেই সব প্রতিনিধিরা যাঁদের সমকামিতা বিষয়ে গবেষণার উৎসাহ আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে অদূর ভবিষ্যতে একটি Resource Centre গড়ে তোলায়।

সামনে পড়েছিল বোধোদয়ের বিস্তীর্ণ ঘাসজমি। ধীর কদমে শুরু হয়েছিল চলা। চলতে চলতে, বলতে বলতে, ঘা'য়ে ঘা'য়ে ভেঙে গেছে কাঁটাঝোপ, পায়ে পায়ে দ'লে গেছে কত ঘাসফুল, চলাচলে তৈরী হয়েছে অস্পষ্ট পথরেখা, যে রেখা থেকে তৈরী হবে রাজপথ, যে পথ আমাদের পৌঁছে দেবে মনুষ্যত্বের উদয়াচলে — তাই চ'লেছি, চলেই চলেছি — কারণ এখনও জানিনা কতটা পথ হাঁটলে প'রে মানুষ হওয়া যায়!

সমলিঙ্গের সম্পর্কে সহানুভূতি নয় চাই চিন্তার স্বচ্ছতা

মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়

ইংরেজ সাহিত্যিক অস্কার ওয়াইল্ডকে এক পুরুষকে ভালবাসার জন্য যে লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল সেটাকে নাহয় ভিক্টোরিয় নৈতিক শুচিবাই বলে চিহ্নিত করা যায় কিন্তু নৈতিকতার আড়ালে আসল যে গভীর কারণ সেটা নিয়ে এই একুশ শতকেও কি বিশেষ আলোচনা হয়? অস্কার ওয়াইল্ডকে শুধু হাজতবাসের অপমানই সহ্য করতে হয়নি, তার সাথে ছিল সামাজিকভাবে একঘরে হওয়া। তাঁর স্ত্রী তাঁকে ছেড়ে চলে যান এবং নিজের সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে যান। তার থেকেও আরো দুঃখের হল তাঁকে সন্তানদের থেকে শুধু অভিভাবক হিসেবেই বিচ্ছিন্ন করা হয়নি, সম্পূর্ণভাবে সম্পর্ক ছেদ করা হয়েছিল। জীবনের শেষ কয়েক বছর তাঁর অসীম নিঃসঙ্গতা ও দারিদ্রের মধ্যে কেটেছিল। অথচ তিনি কোন খুনী বা ধর্ষক ছিলেন না। যে পুরুষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক হয়েছিল তিনি অর্থনৈতিক ভাবে তাঁর আর্ল পিতার উপর নির্ভরশীল ছিলেন। কিন্তু তিনি নাবালক ছিলেন না। তাঁর বাবা ওয়াইল্ডের বিরুদ্ধে বিকৃত কামনা ও ধর্ষণের অভিযোগ এনেছিলেন। এই অভিযোগ ও বিচারপর্ব সেই সময় বিলেতে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছিল। কিন্তু তাঁর পুরুষ প্রেমিক সাহসের সঙ্গে বলতে পারেননি এই সম্পর্ক তার অসম্মতিতে হয়নি। অস্কার ওয়াইল্ড ফ্রান্সে স্বেচ্ছা নির্বাসন নেওয়ার পরেও তিনি কিন্তু ওয়াইল্ডের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেননি। তিনি ফ্রান্সেও গিয়েছিলেন।

এখন পাশ্চাত্যে সমলিঙ্গ সম্পর্ক নিয়ে যদিও গোপনীয়তা নেই তাহলেও ধর্মীয় অনুশাসন কিন্তু এই সম্পর্কের ব্যাপারে এখনো অসহিষ্ণু এবং অনুদার। এই সম্পর্ককে তারা পাপ বলেই মনে করে। আদি বাইবেলের (Old Testament) দুই নগর সোডোম ও গোমোরা বিধ্বংসী আগুনে সম্পূর্ণভাবে পুড়ে যায় সেখানকার নাগরিকদের পাপী জীবন যাপনের জন্য। পাপটি ছিল সেখানকার সব মানুষ খোলাখুলিভাবে সমলিঙ্গের সঙ্গে যৌনজীবন যাপন করত। কেন এই যৌনজীবন পাপের? তাহলে আরও পিছিয়ে যেতে হয়। স্বর্গের বাগানে আদম ও ইভের সম্পর্ক যৌনতাবিহীন ছিল। শয়তান সাপের রূপধরে যখন ইভকে জ্ঞানবৃক্ষের আপেল খাওয়ায় তখন প্রথম ইভ নিজেকে নারী বলে আবিষ্কার করে ও নিজের নগ্নতা সম্পর্কে লজ্জিত হয়ে গাছের পাতায় লজ্জা ঢাকে। ইভ আদমকেও আপেল খেতে প্ররোচিত করে। আপেল খেয়ে আদমও নিজের পৌরুষ সম্পর্কে সচেতন হয় এবং ইভের সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত হয়। কেবল একটি গাছ ছাড়া ঐ বাগানের সব গাছের ফল খাওয়ার অধিকার তাদের ছিল। সেটাই ছিল জ্ঞানবৃক্ষ। ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়ার জন্য স্বর্গের বাগান থেকে আদম ও ইভ নির্বাসিত হয়। ঈশ্বর বিধান দেন নারী পুরুষের যৌন সম্পর্ক শুধুমাত্র বৈধতা পাবে সন্তান ধারণের ক্ষেত্রে। যে যৌন সম্পর্কে সন্তানের জন্ম হবে না সে সম্পর্ক ধর্মীয় মান্যতা পাবে না। ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করে বলে আদম ইভের যৌন সম্পর্ককে পাপ বলে গণ্য করা হয়। এই জায়গা থেকেই খৃষ্টধর্মের বিশ্বাস মানুষ পাপাচারের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে। (We are all born in sin)। যে ধর্মে নরনারীর যৌন মিলনকে পাপ বলা হচ্ছে সেখানে সমলিঙ্গের যৌনমিলন যে মহাপাপ বলে গণ্য হবে তাতে কি আশ্চর্যের কিছু আছে?

সন্তানের জন্যে যৌন মিলনকে মেনে নিলেও কেবলমাত্র যৌনতৃপ্তির জন্যে যৌন মিলনে কোন ধর্মেরই সায় নেই। হিন্দু ধর্মে সমলিঙ্গের যৌনসম্পর্ককে আলাদা করে চিহ্নিত করে পাপ না বললেও পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যার একটাই অর্থ হয়। এখানে পুত্রসন্তানের ওপর জোর দেওয়ার কারণ হিন্দু সমাজ পিতৃতান্ত্রিক। এখানে সন্তানের বংশ পরিচয়, পদবি, ধর্ম সব কিছুই পিতার দিক থেকে স্বীকৃত। মাকে যদিও স্বর্গাদপী গরিয়সী বলা হয়েছে তাহলেও বাস্তব জীবনে তিনি নাবালক সন্তানের ব্যাপারে অধিকারবিহীনা। হিন্দুর মোক্ষলাভ হয় মৃত্যুর পরে পুত্রের হাতে আগুন পেয়ে। তাই পুত্রসন্তানই কাম্য। বিয়ের মত প্রতিষ্ঠানকেও সব ধর্ম জিইয়ে রেখেছে সন্তানের পিতৃপরিচয় সঠিক রাখার জন্যে। তাই বিবাহের বাইরে নারীপুরুষের যৌন সম্পর্ককে আইনও স্বীকার করেনা। এই পিতৃপরিচয়ের শুদ্ধতার জন্যেই নারীর জন্য একগামিতা বাধ্যতামূলক। তাই দেহব্যবসাকে পাপ ব্যবসা আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বেশ্যা পল্লীকে বলা হয় নিষিদ্ধ পল্লী। ধর্মীয় অনুশাসন উপেক্ষা করে নারী বেশ্যা বৃত্তিতে সমাজের বেঁধে দেওয়া নিয়মানুযায়ী দৈহিক ভাবে অপবিত্র এবং সম্মানের উপযুক্ত নয়। বেশ্যা বৃত্তির মুখ্য উদ্দেশ্য শারীরিক লালসা মেটানো, সন্তান উৎপাদন নয়। তাই এদের তথাকথিত সভ্য সমাজ ঘৃণা করে। যদিও কিছু সংগঠন ও মানুষ এদের নাগরিক অধিকারের জন্যে এগিয়ে এসেছে, এরা এখনো ভদ্র সমাজে প্রান্তিক, 'সংসার সীমান্তে।' নারীপুরুষের স্বীকৃত যৌন সম্পর্ক যেখানে এতরকম বিধি নিষেধের নিগড়ে বাঁধা সেখানে সমলিঙ্গের যৌন সম্পর্কের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রত্যাশিত।

পাশ্চাত্যে সমলিঙ্গের যৌন আকর্ষণ এক সময়ে মনোরোগের তালিকায় ছিল। কিন্তু ১৯৭৩ থেকে নতুন করে যখন মনোরোগের সংজ্ঞা নিরূপণ করা হয় তখন এই সম্পর্ককে এই সংজ্ঞা থেকে বাদ দেওয়া হয়। পুরুষের ও নারীর আর একজন নারী বা পুরুষের প্রতি যৌন আকর্ষণ ও সম্পর্ককে ব্যক্তিগত যৌন চাহিদা বলে স্বীকার করে নেওয়া হয় এবং তাদের ক্ষেত্রে এই সম্পর্ককে স্বাভাবিক

বলা হয়। আইন বদলানো হয় এবং নাবালকের সঙ্গে অথবা পশুর সঙ্গে যৌন সম্পর্ককে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। যদিও আমেরিকার বুশ সরকার ঘোরতরভাবে সমলিঙ্গের যৌন সম্পর্কের বিরোধী সেখানকারই কিছু কিছু রাজ্যে এই সম্পর্ককে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ইয়োরোপেও অনেক রাষ্ট্র এই সম্পর্ক এবং সমলিঙ্গের বিবাহকে আইনি স্বীকৃতি দিয়েছে।

খুব সম্প্রতি আমেরিকান আদালত এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছে। ম্যাসাচুসেট্স্-এর নিয়মানুযায়ী সমলিঙ্গের বিবাহ বৈধ। এই আইনকে বাতিল করার জন্যে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জমা পড়ে। হাইকোর্টের এই রায়কে সুপ্রিম কোর্ট বহাল রাখে। এরই সঙ্গে আইনগত ভাবে মামলাটি খারিজ হয়ে যায়। হাইকোর্টের রায়টি গত নভেম্বরে দেওয়া হয়।

কিন্তু আইনের পক্ষে ও বিপক্ষে দুই পক্ষেরই মতামত এই বিষয়ে এক। তারা মনে করছে এই ধরণের আইন সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের অনির্দিষ্ট অনিচ্ছুক অবস্থান ভবিষ্যতে আরও অনেক নতুন বিতর্কের জন্ম দেবে সেনেটে এবং কোর্টে। বুশের পুনর্নির্বাচনের পর তিনি কথা দিয়েছেন তিনি সমলিঙ্গ বিয়ের বিরোধিতায় সংবিধান সংশোধন করবেন যাতে এই ধরনের বিবাহকে বেআইনি ঘোষণা করা যায়। এটাই তাঁর এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

প্রেসিডেন্ট বুশের মুখপাত্র স্কট ম্যাকডোনাল্ড বলছেন, "কিছু বিচারক সামাজিক ভূমিকা পালনে বেশি মাত্রায় সক্রিয়। তাঁরা গোটা সমাজের জন্যে বিবাহের নতুন সংজ্ঞা ঠিক করছে। এবং এই প্রক্রিয়ায় জনগণের কণ্ঠস্বর উপেক্ষা করা হচ্ছে। সেই জন্যে আমাদের প্রেসিডেন্ট কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে সংবিধান সংশোধনে এগিয়ে যেতে দায়বদ্ধ। এই সংশোধন বিবাহের পবিত্রতাকে রক্ষা করবে।"

আমেরিকার সমলিঙ্গের অধিকার রক্ষার সংগঠন লাম্বডা এবং ঐ জাতীয় আরো অনেক সংগঠন সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ে খুশি কারণ ম্যাসাচুসেট্স্-এ সুপ্রিম (হাইকোর্ট) কোর্টের রায় বহাল রাখা হয়েছে। গত এক বছরে তিনহাজার সমলিঙ্গের দম্পতি বিয়ে করেছে। লাম্বডার মুখপাত্র ডেভিড বুকেল বলেন "মোদ্দা কথা হল হাইকোর্টের এই রায় আদতে সব নাগরিককে সমানদৃষ্টিতে দেখায় কারো কোন ক্ষতি হচ্ছে না।" ইনি লাম্বডার আইনি বিবাহ প্রকল্পের একজন উপদেষ্টা। এই সংগঠন সমলিঙ্গের বিবাহইচ্ছুক দম্পতিদের হয়ে চারটি রাজ্যের (ক্যালিফোর্নিয়া, নিউজারসি, নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটন) বিরুদ্ধে মামলা করেছে।

লিবার্টি কাউন্সের ফ্লোরিডার একটি রক্ষণশীল সংস্থা ম্যাসাচুসেট্স্ হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে কেস করেছিল। তাদের যুক্তি হাইকোর্টের এই আইন আমেরিকার সংবিধান বিরোধী। কারণ রাজ্যের বিচারপতিরা এমন একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যা শুধু নির্বাচিত সেনেটের সদস্যরা নিতে পারেন। সুপ্রিম কোর্ট এই বক্তব্য বিনা মন্তব্যে খারিজ করে দিয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ আমেরিকান সমলিঙ্গের বিবাহ সমর্থন করেন না। APS-IPSAS সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখিয়েছে শতকরা একষট্টি ভাগ আমেরিকান এই ধরনের বিয়ে সমর্থন করে না, শতকরা পঁয়ত্রিশ ভাগ করে। (The Statesman 1.12.04)

ইয়োরোপে বেলজিয়াম সমলিঙ্গের বিবাহকে আইনি স্বীকৃতি দিয়েছে। তিরিশে জানুয়ারি ২০০৩ এ বেলজিয়ামের সংসদ একটি আইন পাশ করে সমলিঙ্গের সম্পর্কের নারী পুরুষ উভয়কেই অন্যান্য নাগরিকদের মত বিয়ের সব আইনে সমানাধিকার দিয়েছে। শুধুমাত্র আইনি স্বীকৃতি নয়, এই আইনটি সবরকম অধিকারকে বিস্তৃত করেছে। এর আগে বেলজিয়াম ইয়োরোপের সেই সব রাজ্যের তালিকায় ছিল যারা সমলিঙ্গের বিবাহকে স্থানীয় আইনে স্বীকৃতি দিয়েছিল এবং ট্যাক্স ও সম্পত্তি সংক্রান্ত অধিকারও দিয়েছিল। এই তালিকায় আছে ডেনমার্ক, হাঙ্গেরী, ফ্রান্স ও পর্তুগাল। রাষ্ট্রস্তরে আইনটি যেকোন বিবাহিত, তথাকথিত স্বাভাবিক দম্পতির মতই সমলিঙ্গের দম্পতিদের আইনি এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অধিকারও দিয়েছে। এর আগে একমাত্র নেদারল্যান্ড এই অধিকার দিয়েছিল। বেলজিয়াম হল দ্বিতীয় ইয়োরোপিয়ান রাষ্ট্র। তবে হল্যান্ডের মত এই নতুন আইন দত্তকের অধিকার দেয়নি। যাই হোক সমলিঙ্গের সম্পর্কের নারী ও পুরুষ এই নতুন আইনকে সব নাগরিকের সমানাধিকারের স্বপক্ষে ইতিবাচক পদক্ষেপ বলেই মনে করছে। (The Statesman 23.02.03)

সম্প্রতি ক্যানাডার সুপ্রিম কোর্ট বলেছে প্রস্তাবিত একটি আইন যা সমলিঙ্গের বিবাহকে স্বীকৃতি দেবে তা সংবিধান বিরোধী নয়। কিন্তু সরকার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে গিয়ে এই সব বিবাহ দিতে বাধ্য করতে পারেনা। (The Statesman 13.12.04)

ম্যাসাচুসেট্স্ হাইকোর্টের রায়ের সাত মাসের মধ্যে এই রাজ্যে এই ধরণের বিবাহের বিচ্ছেদের মামলা গোটা রাজ্যের নিম্ন আদালতে জমা পড়ছে। আবেদনকারিদের প্রাচীন ফর্ম ভরতে হচ্ছে স্বামী ও স্ত্রী শব্দগুলি ব্যবহার করে। তবে জশ ফ্রিড্স্, Massachusetts Freedom to Marry Coalition এর প্রতিনিধি মনে করেন দ্রুত বিবাহ বিচ্ছেদের জমা পড়া মামলা নিয়ে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। (The Statesman 13.12.04)

বিদেশ থেকে স্বদেশে ফেরা যাক। খুব সম্প্রতি দিল্লি হাই কোর্ট নাজ ফাউন্ডেশনের (বেসরকারী প্রতিষ্ঠান) আবেদনের ভিত্তিতে একটি জনস্বার্থের মামলা খারিজ করে দেয়। এই মামলা করা হয়েছিল সমলিঙ্গ সম্পর্ককে বৈধ ঘোষণা করার জন্য, এরা ভারতের ফৌজদারী আইনের অন্তর্গত ৩৭৭ ধারা বাতিলের আবেদন করেছিল। এই ধারায় অস্বাভাবিক যৌন সম্পর্ক এক দণ্ডনীয় অপরাধ। নাজ ফাউন্ডেশনের যুক্তি ছিল এই আইনটি সংবিধানের ১৪, ১৫ এবং ২১ নম্বর ধারার মৌলিক অধিকারের বিরোধী। নাজের যুক্তির বিরোধিতায় ভারত সরকার বলে এই আইনটি শুধু অস্বাভাবিক যৌন সম্পর্কে লিপ্ত যারা তাদের শাস্তির জন্য। অস্বাভাবিক সম্পর্কের ব্যাখ্যা হল যে সব সম্পর্ক প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে (against the order of nature)। এই আইনটি শিশুদের ওপর যৌন নির্যাতন বন্ধ করতে প্রয়োগ করা হয়। কারণ ধর্ষণ আইনের ফাঁক ফোকর দিয়ে এই সব অপরাধী ছাড়া পেয়ে যায়। এই আইন কেবলমাত্র সমলিঙ্গের সম্পর্কে লিপ্তদের জন্য নয়। অতএব সংবিধানের ১৫ ধারা লংঘিত হয় না। আইন কমিশনের বক্তব্য ভারতীয় সমাজ সমলিঙ্গের সম্পর্ককে পছন্দ করেনা। আর এই সামাজিক অপছন্দই যথেষ্ট জোরালো কারণ সমলিঙ্গ সম্পর্ককে অপরাধ বলে গণ্য করার জন্য — এমনকি প্রাপ্তবয়স্করাও এই ধরণের সম্পর্কে লিপ্ত হলে এবং গৃহের নিভৃতে হলেও। নিশ্চয় সরকার সুশীল সমাজে নৈতিকতার পুলিশ হতে পারে না, তাহলেও আইনকে সমাজের নৈতিকতার ধারক ও বাহক হতে হবে। এই সব সম্পর্কে সামাজিক বৃহত্তর ক্ষতির কথা মাথায় রাখতে হবে। এটা না হলে মানুষের আইনের প্রতি যেটুকু শ্রদ্ধা আছে তাও থাকবেনা। ৩৭৭ ধারা বিলোপ করলে আইনের কোন বৈধতাই থাকবে না। (Hindu, Delhi ed. 03.10.04)

এই রায়ে আর একবার প্রশ্নাতীতভাবে প্রমানিত হল ভারতীয় আইনের চোখে ব্যক্তির স্বার্থ, তার গণতান্ত্রিক ও মানবাধিকারের চেয়ে তথাকথিত সামাজিক স্বার্থরক্ষা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মানবিক সম্পর্ক বলতে ভারতীয় আইনের চোখে বৈধ কেবলমাত্র সমাজ যেসব সম্পর্ক অনুমোদন করে। কোন সম্পর্ক স্বাভাবিক ও কোন সম্পর্ক নয় তা নির্ভর করবে সমাজের পছন্দ অপছন্দের ওপর। এই রায়ে যে সমলিঙ্গের মানুষ স্বাধীন জীবন যাপন করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হল, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার অধিকার নাগালের বাইরে রইল, এমনকি তারা AIDS-এর মত মরণ ব্যাধির চিকিৎসা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হল তা আমাদের সমাজের সুস্বাস্থ্য রক্ষার ভার যাঁদের হাতে, অর্থাৎ বিচারপতিরা ও সরকার তাদের কোন মানসিক অশান্তি দেবে না। এই রায়টি দেবার সময় বিচারপতি বি সি প্যাটেল ও বি ডি আহমেদ সেই সব প্রান্তিক বঞ্চিত, নির্যাতিত মানুষদের কথা ভাবেননি। ৩৫৪ ধারা ও ৩৭৬ ধারায় শিশু যৌন নির্যাতন বন্ধ করা যায় যদি সঠিক ভাবে তা প্রয়োগ করা হয়।

আমি সংবাদপত্রের কয়েকটি খবর নিয়ে আলোচনা করব। সব ক'টিই খুব মর্মান্তিক। আমি আগেকার ঘটনায় যাচ্ছিনা। যেমন মধ্যপ্রদেশের দুই নারী পুলিশকর্মী। তাদের পারস্পরিক যৌন সম্পর্কের জন্যে প্রথমে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তারা দুজনেই চাকরী থেকে বরখাস্ত হয়। তাদের বিরুদ্ধে সুচতুর ভাবে কর্তব্যে অবহেলা ও গাফিলতির অভিযোগ আনা হয়। এই নিয়ে সংবাদপত্রে প্রচুর রসাল আলোচনা হয়। প্রায় কোনটাই তাদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন নয়। তারপর তারা কোথায় গেল, এখন তারা কিভাবে বেঁচে আছে সে সম্পর্কে সমাজের শুদ্ধতা রক্ষকদেরও কোন ভাবনা নেই।

সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী বুঝতে একটি শব্দের ব্যবহারই যথেষ্ট। সমলিঙ্গের সম্পর্কে যারা লিপ্ত তাদের বলা হয় সমকামী। কিন্তু কেন? এই সম্পর্কগুলি কি শুধু কাম নির্ভর? আমরা কেন তাদের সমপ্রেমী বলব না? প্রেম থেকেই কামে পৌঁছন যায়। অন্য সম্পর্কে আমরা আগে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্কটাই দেখি। প্রেমহীন কামজ সম্পর্ককে আমরা ঘৃণা ও অবিশ্বাস করি। কিন্তু দুজন সমলিঙ্গ মানুষের সম্পর্কে আমরা শুধু কামটাই দেখি। সেই সম্পর্কে যে ভালবাসাও থাকতে পারে সেটার অস্তিত্ব আমরা স্বীকার করি না। আমাদের এই অস্বীকারের শিকার হয়েছে শিলিগুড়ির কাছাকাছি দুই মেয়ে যারা আত্মহত্যা করার আগে লিখে গেছে সমাজ তাদের ভালবাসাকে ও সম্পর্ককে কোনদিনও স্বীকৃতি দেবে না তাই তারা আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। এর পরই ঘটেছে সেই দুঃখের ঘটনা একেবারে ঘরের কাছে। খবরটি এইভাবে প্রকাশিত হয়েছে — **রেললাইনে মাথা, বনগাঁয় মৃত দুই তরুণী** — ট্রেনের নীচে মাথা দিয়ে একসঙ্গে আত্মঘাতী হলেন দুই তরুণী। শুক্রবার দশটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে বনগাঁ স্টেশনের কিছু দূরে, মেদেরপাড়ায়। রাত পর্যন্ত মৃতদের পরিচয় জানা যায়নি। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান মৃত দুই তরুণী ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দুজনেরই বয়স ২০-এর কোঠায়। (আঃ বাঃ পত্রিকা — ২৭.১১.০৪) ২৮শের আনন্দ বাজারের খবর মৃত "আত্মঘাতী দুই তরুণীর পরিচয় মিলল।" নিজস্ব সংবাদদাতা — "বনগাঁর মেদেরপাড়ায় শুক্রবার সকালে রেল লাইনে মাথা দিয়ে যে দুই তরুণী আত্মঘাতী হন পুলিশ তাদের পরিচয় জানতে পেরেছে। তাঁদের নাম কাজলী ঘোষ (১৯) ও অপর্ণা বিশ্বাস (২০)। কাজলীর বাবা শ্যামাপদ ঘোষ জানান, ওই দুজনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এই সম্পর্কের কথা তাঁদের লেখা সুইসাইড নোট থেকে জেনেছে পুলিশ। তাতে লেখা ছিল "সমাজ ও পরিবার আমাদের দুজনের ভালবাসাকে স্বীকৃতি দিল না বলেই স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করলাম" (আঃ বাঃ পত্রিকা — ২৮.১১.০৪)।

এই খবর বেরোলো সেই সময়ে যখন সারা ভারতবর্ষ জুড়ে নারীর বিরুদ্ধে হিংসার প্রতিবাদ পক্ষ পালিত হচ্ছিল (২৫শে নভেম্বর — ১০ই ডিসেম্বর)। আলাদা করে প্রান্তিক সমপ্রেমীদের জন্যে কিন্তু কোন আলাদা প্রতিবাদের দিন চিহ্নিত হয় নি। যদিও ১০ই ডিসেম্বর আলাদা ভাবে মানবাধিকার দিবস হিসেবে চিহ্নিত, এদের মানবাধিকার হরণ নিয়ে ভারতবর্ষের কোথাও প্রতিবাদ বা আলোচনা হয়নি। অধিকাংশ মানবাধিকার সংগঠন এদের সামাজিক স্বীকৃতিকে সমর্থন করেনা। বেশীর ভাগ বামপন্থী বা দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দল ও তাদের নারী সংগঠনরাও এদের বিকৃত কামের মানুষ বলে মনে করে। কিছু নারীবাদী সংগঠন ছাড়া এদের পাশে কেউ নেই।

অমৃতসরের দুই সমপ্রেমী ২৫ বছরের রাজু ও ২২ বছরের মালা অমৃতসরের রক্ষণশীল পরিবারের গণ্ডী পেরিয়ে বাড়ী থেকে পালিয়ে যায়। পরে তারা ফোন করে বাড়ীর লোকদের জানায় যে তারা বিয়ে করেছে এবং তাদের যেন বিবাহিত দম্পতি হিসেবে থাকতে দেওয়া হয়। এই খবর পেয়ে দুই বাড়ীতেই মাথায় হাত। তারা মনে করছে এই হল কলি যুগ। তারা আরও জানিয়েছে যে বাড়ীর লোককে এই মর্মে লিখিত প্রতিশ্রুতি (sworn affidavit) দিতে হবে। ওদের অভিভাবকরা বলেছে "রাজু আর মালা ছোটবেলা থেকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু তাদের মনে এই আছে এ আমাদের ধারণার বাইরে। ওরা সব সময় একসঙ্গে ঘুরত। আমরা হাসতাম যখন ওরা বলতো যে ওরা পরস্পরকে বিয়ে করবে। এখন আমরা বুঝতে পারছি কেন বিয়ের সম্বন্ধ এলেই রাজু এড়িয়ে যেত। মালার মায়েরও একই বক্তব্য", বলছেন রাজুর মা। (The Telegraph 9.12.04)

দোটানায় পড়েছিল অমৃতসর ও চণ্ডিগড়ের পুলিশও। তারা বুঝতেই পারছিলনা কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। চণ্ডিগড় পুলিশ আইন বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়েছে কোন ধারায় ওদের বিরুদ্ধে কেস করা যায়। অমৃতসর পুলিশ এই ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নিতেই নারাজ কারণ তাদের বক্তব্য সমলিঙ্গের বিয়ের ব্যাপারে আইন স্পষ্ট নয়। "আমরা ওদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপই নিতে পারিনা কারণ দুজনেই প্রাপ্তবয়স্ক"। আশিষ কাপুর (ডি এস পি, অমৃতসর সিভিল লাইন্স্)-এর বক্তব্য দুই মেয়ের অভিভাবকরাই থানায় নিখোঁজ ডায়েরী করেছেন। তবে এক আইনজীবির বক্তব্য, "রাজু ও মালার বিয়ে আইনগত দিক থেকে গ্রহণীয় নয়, কারণ আইনে সমলিঙ্গ বিবাহের কোন স্বীকৃতি নেই। হিন্দু বিবাহ আইন, ভারতীয় বিবাহ আইন এবং স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্টে স্পষ্টভাবে বলা আছে বিবাহ তখনই হতে পারে যখন তা একজন নারী ও পুরুষের মধ্যে হয়।" চণ্ডিগড় পুলিশ হিমাচল পুলিশকেও বিশেষ বার্তা জানিয়েছে যদি তারা মধুচন্দ্রিমা করতে সেখানে যায়। "যেহেতু ওদের অভিভাবকরা অভিযোগ জানিয়েছেন যে তারা পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছে আমাদের তো আইনি মতামত জানতেই হবে। যদি তারা গ্রেপ্তার হয় তাহলে পরবর্তী পদক্ষেপ কি হওয়া উচিত তার জন্যই আইনজ্ঞের মতামত জানা দরকার। নারীবাদী সংগঠনের কর্মী রঞ্জি চাড্ঢা বলেছেন কে কার সঙ্গে থাকছে তা নিয়ে কারোর আপত্তি করা অনুচিত। "তবে এই ধরণের বিয়ে কোনভাবেই সমাজকে কিছু দেয় না।" (The Telegraph, 9.12.04)। নিখোঁজ আইনেই তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ তাদের কোর্টে হাজির করলে নিম্ন আদালতের বিচারপতি সঞ্জয় জোশী তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ খারিজ করে দেন। ১০ দিন পালিয়ে বেড়ানোর পরে তারা ধরা পড়ে। তারা দিল্লি পালিয়েছিল। তার আগে রাজু বাড়ী থেকে ১১,০০০ টাকা সরিয়ে নেয়। বিচারপতি

তাঁর রায়ে বলেন দু'জনেরই সাংবিধানিক অধিকার আছে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী জীবন যাপন করার। তাদের জীবনে নাক গলানোর অধিকার কারুর নেই। তবে কোর্ট তাদের পক্ষে রায় দিলেও তারা শান্তিপূর্ণভাবে থাকতে পারবে কি না একমাত্র সময়ই তার উত্তর দেবে। (The Statesman, 13.12.04)

তাদের এই তথাকথিত "অসামাজিক বিবাহ" কি সমাজ মেনে নেবে? কারণ তারা প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। কারণ তারা দুই ভিন্ন বর্ণের। রাজু জাঠ পরিবারের আর মালা দলিত সম্প্রদায়ের। তদুপরি তারা মেয়ে।

তাদের বিরুদ্ধে ৩৭৭ ধারা জারি করা যায় কিনা তাও তর্কসাপেক্ষ। এই ধারাটি সবসময়ই সমলিঙ্গের পুরুষের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য তার কারণ অস্বাভাবিক যৌন আচরণ বলতে যা বর্ণনা দেওয়া হয়েছে আইনে তা পুরুষের যৌনাঙ্গ কেন্দ্রিক। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পশুদের সঙ্গে যৌনসঙ্গম। "আমাদের আইন রচয়িতারা ধরেই নিয়েছিলেন সমলিঙ্গের সম্পর্ক শুধু পুরুষদের মধ্যেই হয়। পুরুষের প্রকাশ্য সমলিঙ্গ সম্পর্ক ঘোষণার সংখ্যা ভারতবর্ষে মেয়েদের তুলনায় অনেক বেশী। তাদের প্রচারও অনেক জোরদার ও অনেক বেশী সংখ্যার মানুষের কাছে পৌঁছয়। সেই তুলনায় সমলিঙ্গ নারীরা সংখ্যাগতভাবে বিচ্ছিন্ন ও প্রায় অদৃশ্য।(The Telegraph Editorial : Women in Love :. 10.12.04)

কিন্তু ছবিটা যে আস্তে আস্তে পাল্টাচ্ছে তার খবর কজন রাখে? তারা আগের থেকে অনেক সরব হয়েছে। এখন লেখক, চিত্র নির্মাতা, বুদ্ধিজীবি ও আইনজ্ঞরা তাদের মানবাধিকার নিয়ে প্রকাশ্যে বিবৃতি দিচ্ছে। কিন্তু প্রচারমাধ্যম এখনো মেয়েদের সমলিঙ্গের সম্পর্ককে রসাল চাটনি হিসেবেই পরিবেশন করে।

মেয়েদের নামকরা পত্রিকায় এই বিষয়ে বিশেষ লেখা বা বিতর্ক থাকলে তা উচ্চকিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষণা করা হয় পরিচ্ছেদের ছবি সহ। স্টলে আসার সঙ্গে সঙ্গে হাতে হাতে ঘোরার এটি পাকাপোক্ত ও পরিচিত বন্দোবস্ত। তাদের জীবনের একাকিত্ব, শূন্যতাবোধ নিয়ে এইসব পত্রিকার কোন আগ্রহ নেই। এমনিতেই নারীর জীবন প্রচণ্ড অর্থনৈতিক ও সামাজিক চাপের মধ্যে আটকে। এর সঙ্গে যদি সমলিঙ্গতা যুক্ত হয় তার পক্ষে তা আর এক বাড়তি চাপের বোঝা হয়ে ওঠে। যে সমাজ ব্যতিক্রমী, অন্যরকম মানুষের প্রতিই অত্যন্ত নিষ্ঠুর সেখানে কোন নারীর সমলিঙ্গের সম্পর্কের আইনি স্বীকৃতি চাওয়া প্রচণ্ড সাহসের"। (The Telegraph Editorial : 10.12.04)

এই সম্পর্কের বেদনাদায়ক পরিস্থিতিও আমরা দেখেছি এদের আত্মহননের মধ্যে। গভীর ভালবাসার সম্পর্ক হলেও সেই ভালবাসা প্রেমের মর্যাদা পায় না। সমাজ সমলিঙ্গের স্নেহের সম্পর্ক স্বীকার করে এক মাত্র মা ও মেয়ের মধ্যে। এর বাইরে নারীর সঙ্গে নারীর প্রেমকে ভাবা হয় যৌন বিকৃতি। ভারতে এখনো সমকামী মানুষকে মনোরোগী বলেই মনে করা হয়। কলকাতার এক পুরোনো নারীদের আশ্রয়সংস্থা হোমের দুজন নারীর মধ্যে সমলিঙ্গের সম্পর্ক আছে সন্দেহ করে তাদের আলাদা করে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নামী দামী আলোচনাচক্রে একজন নারী মনোরোগ বিশেষজ্ঞ অনায়াসে ঘোষণা করেন সমলিঙ্গের যৌন সম্পর্ক বিকৃতির মধ্যে পড়ে। তাঁর এই উক্তির প্রতিবাদ কিন্তু খুব জোরালো হয়নি। তবু নারীরা যে কিছু সংখ্যায় খোলাখুলি নিজেদের যৌন পছন্দ ঘোষণা করছে তাতেই সমাজের রক্ষক জ্যাঠামশায় এবং যৌন আইন বিশেষজ্ঞরা অশনি সংকেত দেখছে। সমলিঙ্গ যৌনতাকে মনে করা হয় গভীর পাপ এবং এক লজ্জাজনক রোগ। তবু তারই মধ্যে পুরুষের নারীর থেকে অনেক বেশী বিকল্পের সুবিধে আছে। তাদের সামাজিক নিয়মের ফাঁস থেকে বেরিয়ে আসার রাস্তা আছে, নারীর সেই বিকল্পের সম্ভাবনা আরো কম।" (The Telegraph)

২৭শে নভেম্বর পাটনা পুলিশ দুই নারী সরিতা ও পূজাকে গ্রেপ্তার করে মধ্যপ্রদেশের ঝান্সি থেকে। সরিতাকে পাটনায় এনে তার মা-বাবার কাছে ফেরৎ দেওয়া হয় কিন্তু পূজার ঠাঁই হয় বেউর জেলে। কিন্তু অমৃতসরের রাজু ও মালার মত এই দুই নারীও সর্বসমক্ষে ঘোষণা করে যে তারা একসঙ্গে থাকবে। দুজনেই সাবালিকা, কিন্তু জেলে গেল একজন। কারণ সরিতার অভিভাবকরা পূজার বিরুদ্ধে অপহরণের অভিযোগ আনেন। **(The Statesman : 16.12.04)**

দুজন ভালবাসার মানুষের একসঙ্গে ঘর বাঁধার, স্বপ্ন দেখার, সুখ দুঃখের ভাগ নেওয়ার অধিকার কেন সামাজিক রক্ষণশীলতা হরণ করবে? সংবিধানও তাদেরএই অধিকার দেয়নি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে অমৃতসর আদালতের ব্যক্তির অধিকার সম্পর্কে বিচারপতির রায় আশার আলো দেখায়। কিন্তু প্রশাসনও জনমানসে এই অস্বস্তি এনেছে। এই অস্বস্তি খাস প্রশাসনেই যে রহিয়া গিয়াছে, তাহা পাঞ্জাব প্রশাসনের এক কর্তার মনোভাবেই স্পষ্ট। "তিনি বলিয়াছেন, যে রাজ্যে পুরুষের তুলনায় নারীর অনুপাত শঙ্কাজনকরূপেই কম, সেই রাজ্যে এই ধরণের বিবাহ বিপদকে গভীরতর করিতে পারে। অস্যার্থ, বিবাহকে প্রজননমুখী না করিলে বিপদ সমাধিক। বিবাহ সম্পর্কে শরীরে এমন প্রয়োজনসর্বস্বতার সিলমোহর প্রদান বস্তুত পুরুষতন্ত্রেরই পরিচিত ছক। সেই ছাঁচের কথাটি যখন প্রশাসনিক কর্তার মুখে উচ্চারিত হয় তখন সেই কর্তাকে নিছকই জনৈক 'ব্যক্তি' বলিয়া গণ্য করার উপায় থাকে না। গভীরে কোথাও প্রশাসন-তন্ত্রের সহিত পিতৃতন্ত্র একাকার হইয়া যায়। যাহা অনুচ্চারিত থাকে, তাহা হইল কন্যাভ্রূণ নাশে পিতৃতন্ত্রের কৌশলী ছক। ঐ কর্তাব্যক্তি কি জানেন না, তাঁহার রাজ্য সহ উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মেয়েদের সংখ্যা কমিবার একটি বড় কারণ কন্যাভ্রূণ হত্যার ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধি? সমকামী বিবাহকে এজন্য দোষারোপ করিবার বুদ্ধি কি অজ্ঞতার ফল, না দুরভিসন্ধির পরিচায়ক?" (আঃ বাঃ পঃ — ১৩.১২.০৪)।

আমরা যারা প্রতিটি মানুষের ব্যক্তি অধিকারে বিশ্বাসী, তার নিজেদের পছন্দের অধিকারের দাবী সমর্থন করি, তাদের কাছে এই রায় আলোক বর্তিকা। বিশেষ করে যখন মাথায় রাখি ৩৭৭ ধারা বিলোপের জন্য নাজ ফাউন্ডেশনের আবেদন দিল্লির উচ্চ আদালত খারিজ করে দিয়েছেন বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থে, ঠিক দু'মাস আগে।

এই রায় কি কোন নজির সৃষ্টি করতে পারবে যাতে সমলিঙ্গের নারীকে পরিচয় গোপন করতে না হয়, যাতে সে তার প্রিয় ভালবাসার মানুষটিকে নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা করতে পারে। ভুল স্বর্গ নয় তার স্বর্গও যে সুন্দর ও স্বাভাবিক এই স্বীকৃতি এই রায়ের ফলে হবে? প্রশ্নটি সহজ কিন্তু উত্তর জানা নেই কারণ 'The answer is still blowing in the wind."

■ *মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায় — 'নারী নির্যাতন প্রতিরোধ মঞ্চ' -এর সক্রিয় সদস্য, নারীবাদী আন্দোলনের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত এবং বিশিষ্ট (নারী বিষয়ক) লেখিকা*

আলোছায়ার সীমানায়

শাশ্বতী ঘোষ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই মুহূর্তে অন্যতম নামকরা নারী অর্থনীতিবিদ ডেয়র্ড্রে ম্যাকলোকস্কি অথবা ডোনাল্ড ম্যাকলোকস্কি। নিজে হার্ভার্ডের অর্থনীতির ছাত্র। বাবাও ছিলেন হার্ভার্ডের মাস্টারমশাই। নিজে দীর্ঘদিন ছিলেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখন আছেন আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। অর্থনীতি ও ইতিহাস বা অর্থনৈতিক ভাবনার ইতিহাস, প্রকরণ প্রভৃতির পঠনপাঠনে যুক্ত। কিন্তু ডোনাল্ড, ডেয়র্ড্রে হন কী করে? নাম শুনে তো মালুম হয় ডোনাল্ড পুরুষ এবং ডেয়র্ড্রে নারী! ব্যাপারটা গোলমেলে লাগলেও সত্যি। ১৯৯৫ সালের অগস্ট মাসে, বাহান্ন বছর বয়সে ডোনাল্ডের মনে হল তিনি যতই দোর্দণ্ডপ্রতাপ মাস্টারমশাই হন না কেন, আসলে তিনি পুরুষের শরীরের খোলে আটকে থাকা এক নারী। অতএব দীর্ঘদিনের পরিবার, স্ত্রী, দুই প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান — সবার অমতে লিঙ্গ পরিবর্তনের একাধিক শল্যচিকিৎসা এবং হরমোন প্রয়োগের ফলে তিনি পরিণত হয়েছেন নারীতে। ডোনাল্ড থেকে ডেয়র্ড্রেতে।

ডেয়র্ড্রের এই পরিবর্তন নানা স্তরে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। এক দিকে এসেছে নারী-পুরুষের মধ্যে বিভাজন কতটা জৈবিক আর কতটাই বা সামাজিক সেই পুরানো প্রশ্ন। অন্য দিকে সমাজবিজ্ঞান হিসাবে অর্থনীতিতেও প্রকৃত নিরপেক্ষতা বলে কিছু হয় কি না — নাকি ব্যক্তির উপলব্ধি তার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার রঙে রাঙানো — সেই প্রশ্নও। তাঁর মতে যতদিন তিনি পুরুষ ছিলেন, ততদিন দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা তাঁকে শিকাগো স্কুলের কঠোর অনুসারী করে রেখেছিল। কিন্তু নারী হওয়ার পর তাঁর অভিজ্ঞতা ধীরে ধীরে শিকাগো স্কুল থেকে তাঁকে 'খোলাবাজারপন্থী নারীবাদী' করে তুলেছে।

নারী পুরুষের দেওয়ালটা কি শুধুমাত্র জৈবিক? স্তন বা জননাঙ্গের মতো শারীরিক বৈশিষ্ট্য দিয়েই কি আমরা নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করব? তা হলে যে নারী ক্যান্সার বা অন্য কারনে স্তন বা জরায়ু বাদ দিতে বাধ্য হয়েছেন, তিনি কি নারী নন? নিশ্চই তা নয়। অর্থাৎ নারী শুধু যৌনচিহ্ন দিয়ে নির্দিষ্ট নয়, তা সামাজিক আচরণ দিয়েও নির্ধারিত। সে জন্য আমরা ইস্ট্রোজেনহীন, জরায়ুহীন, স্তনহীন কোনও নারীর কথা ভাবলে টেস্টোস্টেরনহীন, শিশ্নহীন কোনও পুরুষকেও নিশ্চয়ই ভাবতে পারি।

অনেকে বলবেন নারী এবং পুরুষের বিভাজনে ক্রোমোজোমই শেষ কথা। আমরা জানি XX হল নারী আর XY পুরুষের ক্রোমোজোম। কিন্তু নানা গবেষণা দেখিয়েছে যে ক্রোমোজোম দিয়েও চূড়ান্ত ভাবে নারী পুরুষ নির্দিষ্ট করা যায় না। উভলিঙ্গ মানুষরা ব্যতিক্রম নয়, খুব নিয়মিত বিষয়। কিন্তু তাঁরা সারা জীবন কোনও না কোনও লিঙ্গকে অবলম্বন করে নারী বা পুরুষ হয়ে জীবনটা কাটিয়ে দেন। দেখা যাচ্ছে শিশুরা অনেক সময় নারী বা পুরুষ উভয়ের চিহ্ন নিয়েই জন্ম নিচ্ছে। কারও থাকে XXY ক্রোমোজোম; কারও বা XX ক্রোমোজোমের সঙ্গে শিশ্নের অবস্থান; কারও বা XY ক্রোমোজোমের সঙ্গে জরায়ু; কারও বা একই অঙ্গে নারী-পুরুষ উভয়েরই যৌনচিহ্ন। তাই শরীরের যৌনচিহ্নের সঙ্গে সমান প্রয়োজন হয়ে ওঠে সামাজিকরণের প্রশ্নটিও। অর্থাৎ শুধু শরীর দিয়েই নারী-পুরুষ নির্দিষ্ট হয় না, তাকে সমাজস্বীকৃত আচরণ আয়ত্ত করে নারী বা পুরুষ 'হয়ে' উঠতে হয়।

নারী 'হয়ে ওঠার' এক দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন ডেয়র্ড্রে তাঁর আত্মজীবনীতে। কি করে একজন সমসাময়িক, শ্বেতাঙ্গ, উচ্চমধ্যবিত্ত মার্কিন নারী হয়ে উঠলেন তার বিবরণ। পোশাক-আশাক, কেশকলা, মেকআপ এবং এক লক্ষ ডলার মূল্যের বেশ যন্ত্রণাদায়ক শল্যচিকিৎসা দিয়ে শরীরটাকে সঠিকভাবে রূপান্তর করে এই 'হয়ে' ওঠার সবে শুরু। এর পর নিজের আচরণকে স্বাভাবিক করে তুলতে তাঁকে হাজার হাজার ছোট্ট ছোট্ট আচরণবিধি আয়ত্ত করতে হয়েছে। সেগুলি লক্ষ করতে হয়েছে, অনুকরণ করতে হয়েছে এবং তার পর যথাসময়ে প্রয়োগ করতে হয়েছে। শিখতে হয়েছে বসা, হাঁটা, কী ভাবে এবং কখন কথা বলবেন (অথবা বলবেন না), কখন চোখে চোখ রাখবেন বা রাখবেন না। সবচেয়ে বেশি করে শিখতে হয়েছে মেয়েদের থেকে সবচেয়ে বেসি যে আচরণ প্রত্যাশিত, সেই আচরণ — তাঁর ব্যক্তিত্ব যেন অন্যের পক্ষে বাধা না হয়ে ওঠে।

পুরুষালি মেয়ে বা মেয়েলি ছেলেরা এখনও নানা বৈষম্যের শিকার। বড়জোর সস্নেহ প্রশ্রয় থেকে শুরু, কিন্তু প্রয়শই তা পৌঁছয় ব্যঙ্গতে, এমনকি শারীরিক নির্যাতনে। তাদের দোষ যে তারা সমাজনির্দিষ্ট আচরণের সীমা অতিক্রম করেছে। সুসভ্য সমাজ সরাসরি দাঁত নখ বার করে না। তারা বিশেষজ্ঞদের এগিয়ে দেয় — যারা অসুখটা 'সারিয়ে' দেবে। মার্কিন সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশন ১৯৭৩ সালে সমকামিতাকে মনোরোগের তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে। কিন্তু এখনও 'জেন্ডার আইডেন্টিফিকেশন ডিসঅর্ডার' বা নিজের নারী বা পুরুষ পরিচয়কে অপছন্দ করার ব্যাপারটা মনোরোগ বলে চিহ্নিত। তা বিশেষজ্ঞদের হাতে দিয়েছে ডেয়র্ড্রের মতো মানুষদের অসুস্থ ঘোষণা করে সংশোধনের ক্ষমতা। মনস্তত্ত্ববিদ বোনের থেকে ডেয়র্ড্রে সহায়তা পাবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু সেই বোনই পেশাদারি পরিচয়ের জোরে ডেয়র্ড্রেকে নানা ভাবে শাস্তি দিয়ে সারাতে চেষ্টা করেছেন। বারবার তাঁকে যেতে হয়েচে সংশোধনাগার থেকে জেলে। এমনকি সোশ্যাল সায়েন্স হিস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশনের এক বিশেষ আলোচনা সভা — যা কিনা তাঁর এই ক্ষেত্রে অবদানের জন্যই আয়োজিত হয়েছিল, সেখান থেকে শিকাগো পুলিশ তাঁকে জোর করে তুলে নিয়ে গেছে। এত ঝড়ঝাপটার মধ্যেও ডেয়র্ড্রের গবেষণা থেমে থাকেনি। ১৯৯৬ সালে সম্মানিত ইস্টার্ন ইকনমিক জার্নালে তাঁর লেখা কলমগুলি পুস্তকাকারে বেরিয়েছে। ১৯৯৯ সালে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হয়েছে আত্মজীবনী 'ক্রসিং'। ২০০০ সালে অর্থনীতির প্রকরণ নিয়ে মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আর একটি নিবন্ধ সংকলন প্রকাশ। এখন তিনি পেশাগত বা ব্যক্তিগত কোন স্তরেই সাহায্য চাইতে সঙ্কোচ বোধ করেন না — যা তিনি পুরুষ অবস্থায় করতেন। ভাবতেন সাহায্য চাওয়া দুর্বলতা বা অক্ষমতার লক্ষণ।

(৭ পাতায় দেখুন)

Names and Words

Shuddhabrata Sengupta

In a conversation with friends from Sappho in Delhi last year, I had once expressed my reservations about the way in which the language of naming names lays traps for all those who wish to construct lives in a relationship of alterity to heterosexism. What I am writing here is an effort to take that conversation further.

I have a difficulty with words like Homosexual, Lesbian, Bisexual. They all have an ugly, almost clinical sound. A sound almost as ugly as the word 'Heterosexual'. All of these words (and their existing or potential counterparts in some Indian languages - Shomokami or Shomokamini for Gay or Lesbian, Savyakami for Bisexual - as in Savyasachi - standing for ambidexterity) seem to me to be caught within a logic of definitional clarity that places too many constraints on the complexity of actual lived experience.

We all know that butterflies are caught, killed and pinned on to the collection boards of butterfly collectors, and then named as to the minutiae of their genera and species. This naming and classification of butterflies is called 'Lepidoptery' (after the Latin name for Butterflies). Sometimes the anxiety to put people in boxes with the names homosexual, heterosexual and bisexual seems to me to be a kind of 'lepidopteric' operation in the domain of desire. What gets caught, pinned, classified is the enigma, the delight, the ambiguities and the mysteries of our desires and actions. I like my butterflies better when they fly.

I find it easier to think of homosexual, or heterosexual or bisexual acts, thoughts, desires, affects and situations, than to think of homosexual, heterosexual and bisexual people. I am a person who speaks Bangla on occasion, English, or Urdu on other occasions. That tells you more about me and what I am than the inadequacy of a term like 'Probashi Bangali'. I am born and raised in a city called Delhi, and my 'probash' could be Kolkata, but to continue to insist on my identity as a 'Probashi Bangali' recognizes neither the conditions of my life, nor the fact that I happen to be a Bangla speaking person who happens to live in Delhi. Similarly, the fact that I may or may not experience different kinds of desire for different kinds of people, some of whom are women, can actually say very little about me. So what can I, or you, or anyone else call themselves.

Naming oneself, finding ways to talk about the person one is when one desires someone else, is not in and of itself a meaningless exercise. Let us say that you are a woman who desires another woman, as a friend, as a lover, as a companion - what does that make you, and how might you begin to name yourself, - with elegance, with affection, with dignity and with the necessary admixture of precision and ambiguity that allows you to name your desire and refuse to be identified as a specimen at the same time.

Recently I came across a word that I have become fond of in Vyatsayan's Kama Sutra. The Kama Sutra, for all its patriarchal biases and classificatory obsessions continues to be a celebration of the diversity of human sexuality. I would like to offer this word as a token of my friendship and solidarity with all women who sometimes or always desire other women as friends, lovers and companions. The word is 'Svairini' and it occurs in the lengthy description of women who take women as lovers in the chapter on 'Purushayita' (the sexually assertive woman). In standard translations of the Kama Sutra, the word 'Svairini' is often glossed as 'Lesbian'. But I would suggest that it has a larger, more generous usage in Sanskrit, which is precisely why I would suggest claiming it for an affirmative act of naming.

'Svairini', comes from the root word 'Svair' which is glossed in the revised and enlarged edition of the 'Practical Sanskrit English Dictionary' by Vaman Shivaram Apte as "Following one's own will or fancy", "self willed, wanton, uncontrolled, unrestrained", "At will, at one's pleasure, Of one's own accord, spontaneously. Slowly, gently, mildly. Unreserved Conversation. Free , Independent. Unimpeded. Acting as one likes."

Two entries down, we find the word 'Svairini' which is glossed as "A loose or unchaste woman. A wanton woman. An adulteress. A line of ascetics". Principal Apte, following the prevailing fashion of repressing all references to non heterosexual realities, does not indicate that the term 'Svairini' is read as a woman who desires other women in the Kama Sutra, but his very silence - which has made its way into standard vocabularies of most Indian languages - is today, an opportunity to invest it with new meanings.

So we take the word 'Svairini' as it is used in the Kama Sutra - as a woman who desires and has sexual relations with other women, (not always and only, but generally) and invest it with the meanings we find in Apte's dictionary - Wanton, Free, Self Willed, Independent, Ascetic, Adulteress, Unchaste'.

The picture that emerges from this act of reading the pronouncements of the Kama Sutra against the silences of a dictionary creates a wonderful new picture - of a woman who acts as an active agent, creating her own world of desires - sometimes as a woman who desires women, sometimes as a woman who does not act according to the constraints of marital vows, sometimes as a renouncer, sometimes as one who earns her living with her body, and at all times as a free person, responsible to her own self and her desires.

In all my friends who are women - who possess in varying measures the qualities of strength, keen intelligence, a sharp sense of humour, a robust worldliness, a passion for freedom and pragmatic willingness to act on the basis of their desires - I have seen traces of what I can best call 'Svairini' hood. It is no accident that several of these people have been women, who along with all the other qualities I have just enumerated, were also people who happen to love or desire other women. When I see them as aspects of the 'Svairini', I see free, active subjectivities that are open to change, to transformation, to the shaping of the world through the actualization of desire. And most of all, in Sanskrit, Bangla or in Hindi, with or without an aspirated sibilance, I like the way the word sits on my tongue.

■ *Shuddhabrata Sengupta is a media practitioner and writer, a member of the Raqs Media Collective and a co-initiator of the Sarai Programme of the Centre for the Study of Developing Societies (www.sarai.net)*

নারী যদি কইতো কথা ...

অনুপ ধর

সারারাত জ্বলেছে নিবিড় ... ধূসর নীলাভ এক তারা।
তারই কিছু রঙ নাও তুমি,
না পাওয়ার রঙ নাও তুমি।

সারারাত ... রাত জেগে রয় এক নারী। অন্য এক নারীর জন্য। অন্য এক নারীর খবরের অপেক্ষায়। খবর আসে না। না পাওয়ার ধূসর নীল নিবিড়তায় রাত ভোর হয়। রাত ভোর হলে হাসপাতালের রিসেপশন-এ তার বন্ধুর খবর জানতে যায়, জানতে চায় রাতজাগা সেই নারী। জানতে পারে তার বন্ধু রাতের অন্ধকারেই তাকে ছেড়ে চলে গেছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাকে খবর দেয় নি। যদিও সে অপেক্ষা করছিল হাসপাতালেরই ওয়েটিং রুম-এ। খবর দেয়নি কারণ সে সেই অসুস্থ ও চিকিৎসাধীন নারীর কেউ নয়। অফিসিয়াল-ই কেউ নয় — রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়-পরিজন নয়, আইনী সম্পর্কেরও (বিবাহ, দত্তক, ইত্যাদি রাষ্ট্র-স্বীকৃত আইনি সম্পর্কেরও) কেউ নয়।

সে অন্য নারীর বন্ধু।
শুধু বন্ধু।
বন্ধু শুধুমাত্র।
বন্ধু মাত্র।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাই তাকে খবর দেয় নি।

বন্ধুত্বের বন্ধুত্ব নামের সম্পর্কটির কোনও জৈবিক অথবা আইনি লেজিটিমেশন নেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে — রাষ্ট্রের কাছে। রাষ্ট্র জৈব সম্পর্ক বোঝে, রক্তের সম্পর্ক বোঝে, রাষ্ট্রের স্বীকৃত আইনি সম্পর্ক বোঝে। রাষ্ট্র রক্তের অথবা আইনের আত্মীয়তা বোঝে। রাষ্ট্র বৈধ জন্ম (লেজিটিমেট বার্থ) — বৈধ বিবাহ বোঝে। সমাজ পুরোহিত-মন্ত্র-শাঁখা-সিঁদুর-সম্প্রদান-এর বিধানের সীমানায় স্থিত বিবাহ সম্পর্ক বোঝে। রাষ্ট্র ম্যারেজ রেজিস্ট্রার-এর অনুমোদনে বৈধ আইনি বিবাহসম্পর্ক বোঝে। রাষ্ট্র লেজিটিমেট সম্পর্ক বোঝে — কোনও না কোনও অর্থে যা লেজিটিমেট — জৈবিক অর্থে, আইনি অর্থে। তুমি আমার বয়ফ্রেন্ড, আমি তোমার গার্লফ্রেন্ড — আমরা একসাথে 'লিভ টুগেদার' করি এক ছাদের তলায়। ইদানিং আধুনিক রাষ্ট্র, অন্ততঃ পশ্চিমে, এই সম্পর্কের প্রতিও কিছুটা হলেও সংবেদী। কিন্তু বন্ধুত্বের সম্পর্ক? বন্ধুত্ব — দুটো মেয়ের বন্ধুত্ব? রাষ্ট্র কিভাবে স্বীকার করবে সেই সম্পর্ক যা জৈবিক অথবা আইনি — কোনও অর্থেই লেজিটিমেটেড — বৈধ হয় নি, হয়ে উঠেনি। এমনকি সামাজিক-সাংস্কৃতিক সম্মতির ন্যূনতম বৈধতাও সে সম্পর্ক পায়নি অথবা অর্জন করে উঠতে পারেনি।

হাসপাতালের ওয়েটিং রুমে ... বন্ধুর জন্য ...
তাই এই রাতজাগা একাকীত্ব ... নির্মম ... নিষ্ঠুর।
তাই এই না পৌঁছাতে পারা ... এই পৌঁছাতে না পারা।

রাষ্ট্র বৈধ সম্পর্ক বোঝে। প্রথাগত অর্থে যা বৈধ। আধিপত্যকারী সমাজসংগঠনের অর্থে যা বৈধ। তুমি আমার বিবাহিত স্ত্রী। তোমার আমার সম্পর্ক আইনগতভাবে বৈধ। তুমি আমার গার্লফ্রেন্ড। তোমার আমার সম্পর্ক সামাজিক সম্মতি-স্বীকৃতিতে বৈধ। তুমি আমার সন্তান। তোমার সাথে আমার রক্তের সম্পর্ক। তুমি আমার ভাইপো। তোমার সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক।

তাই তোমার কাছে সর্বপ্রথম পৌঁছে যায় আমার মৃত্যুর খবর। যদিও তুমি আমার খোঁজ নাওনি কোনদিন। আর যে নারী চলার পথের সাথী, যার সাথে আমি গড়ে তুলেছি শেয়ার করেছি দিনযাপনের স্পেস, যে হাসপাতালের ওয়েটিং রুমে রাত জেগে বসে আছে আমারই ভাল-মন্দর অপেক্ষায় — হাসপাতালের তার দেওয়ালের মধ্যে থেকেও সে আমার খবর পেল না। আমার শেষতম মূহূর্তে আমার পাশে থাকল না। কারণ রাষ্ট্রের কাছে, এমনকি বৃহত্তর সমাজের কাছেও সে আমার কেউ নয়।

কারণ সে শুধুমাত্র আমার বন্ধু।
বন্ধু।
অর্থাৎ কেউ নয়।
Nobody

রাষ্ট্র ও সমাজ বৈধ সম্পর্ক বোঝে।
বিবাহ বোঝে, প্রথাগত প্রেম বোঝে।
কিন্তু বন্ধুত্ব বোঝে না।

রাষ্ট্র ও সমাজ স্থির সম্পর্কের সংজ্ঞাগুলিকে, স্থির সংজ্ঞার সম্পর্কগুলিকে বুঝতে পারে, ধারণ করতে পারে। কিন্তু বন্ধুত্ব ... শিথিল সংজ্ঞার বন্ধুতাকে ... দুটি নারীর বন্ধুত্বকে ধারণ করতে, ধারণায় আনতে পারে না।

বন্ধুর মৃত্যুকে ঘিরে তাই গড়ে ওঠে এক নির্মম সলিচিউড।
হয়তবা এক সলিডারিটিও।
এক অলঙ্ঘ্য বিচ্ছিন্নতা।
হয়ত বা এক নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্কসাধনও। যা মৃত্যুকে উপচে যায়, উত্তরে যায়।

বন্ধুতার অপমৃত্যু

এই গল্পটি দুটি নারীর গল্প। যারা একই বাড়িতে থাকে। যারা একসাথে শেয়ার করে একটি স্পেস। বয়স তাদের সম্ভবতঃ ষাটের উপর। তাদের বাড়ির বাইরের বাগানে আছে একটি পাখির ঘর। পাখির বাসা। পাখির ডিম ফুটে বাচ্চা হয় সে ঘরে। সেই ঘরেরই পরিচর্যা করতে করতে অসুস্থ হয়ে পড়ে একটি নারী। সেইভাবেই হাসপাতালে আসা। সেইভাবেই হাসপাতালের ওয়েটিং রুমে রাতের প্রতীক্ষা। সেইভাবেই রাতের অন্ধকারে দুই বন্ধুর একা ... একা একা হয়ে যাওয়া। গল্পটা 'If These Walls Could Talk'-Part II চলচ্চিত্রের প্রথম অংশ থেকে নেওয়া। চলচ্চিত্রে অচিরেই মৃত নারীর ভাইপো প্রচুর সমবেদনায় ভর করে হাজির হয় জীবিত নারীর কাছে। হাজির হয় মৃত নারীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারের জন্য। ওদের এতদিনের শেয়ার করা বাড়িটি মৃত নারীর নামেই থেকে গিয়েছিল। মৃতের বৈধ আত্মীয় তাই উত্তরাধিকারের বৈধ দাবী জানিয়ে যায় এবং অচিরেই সম্পত্তির দখল নেয়। শেয়ারড সেই স্পেস থেকে উৎখাত হয়ে যায় যায় জীবিত নারীটি — উৎখাত হয়ে যায় স্মৃতিঅবলম্বনের শেয়ারড স্পেসটি থেকে — স্মৃতি থেকে নয়।

বন্ধুতার এই অস্বীকৃতিতে আমরা কষ্ট পাই।
ভাবি কেন এমন হয়।

কিন্তু বন্ধুতার অপমৃত্যু তো ঘটেছে অনেক অনেক আগে। হয়তো সেই উনিশ শতকেই। বা হয়তো তারও আগে। অন্ততঃ পশ্চিমে। দুটি নারীর বন্ধুত্ব যখন থেকে চিকিৎসাবিদ্যা, যখন থেকে চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণার বিষয় হয়ে উঠল। যখন থেকে দুটি মেয়ের বন্ধুত্ব আর শুধুমাত্র বন্ধুত্ব রইল না। যখন থেকে তাদের বন্ধুতার নাড়ী-নক্ষত্র, তাদের বন্ধুতার সত্য-সন্ধান জানতে চিকিৎসাবিজ্ঞান নিতান্তই উদগ্রীব। যখন থেকে বন্ধুত্বের হাঁড়ির খবরে যৌনজীবনের খবরাখবরে সচেষ্ট আছে চিকিৎসাবিজ্ঞান — বিশেষতঃ সাইকিয়াট্রি। যখন থেকে দুটি মেয়ের বন্ধুত্ব হয়ে উঠেছে প্যাথলজিক্যাল গবেষণার বিষয়। যখন থেকে দুটি মেয়ের বন্ধুত্ব নিতান্তই প্যাথলজিক্যাল। আধিপত্যকারী পুরুষ-নারীর 'বিসমকাম' সম্পর্ক নয় বলেই সে বন্ধুত্ব প্যাথলজিক্যাল। যখন থেকে 'সমকামিতা' বা 'হোমোসেক্সুয়াল' এই ক্যাটেগরির জন্ম তখন থেকেই বন্ধুতার মৃত্যু।

বন্ধুতার অপমৃত্যু।

বন্ধু তুমি — তাই সারারাত জ্বলছেনিবিড় ... ধূসর নীলাভ॥

■ *অনুপ ধর — মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে উৎসাহী একজন চিকিৎসক। সাইকিয়াট্রি - সাইকো অ্যানালিসিসের পরিসরে লিঙ্গ ও যৌন রাজনীতি নিয়ে গবেষণারত। বর্তমানে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটিতে মানবী বিদ্যাচর্চা বিভাগের গবেষক এবং স্যাফো ফর ইক্যুয়ালিটির নবীন সদস্য।*

'স্যাফো' - কে

চিন্ময় ভট্টাচার্য্য

'স্যাফো'র সঙ্গে পরিচিত হবার কথা বলার আগে আমার সম্বন্ধে দু-একটি কথা জানানো প্রয়োজন। যে বাড়ীতে আমি জন্মেছিলাম, সেখানে একটি ভারি উদার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। আমার দাদামশাই মহিলাদের যেরকম সম্মান করতেন, তা আর কোথাও আমার চোখে পড়েনি। ছোটবেলা থেকেই আমাকে শেখানো হয়েছিল সবাই মানুষ — নারী কিংবা পুরুষ নয়। একবার দাদামশাইকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম বিধবা বিবাহ সমাজ কিছুতেই জনপ্রিয় হল না কেন? উনি বলেছিলেন, এর উত্তর খুবই সোজা। বিধবা মানে বাড়ীর কাজের লোক যে কিনা খাটবে বেশী, খাবে কম। প্রায় বিনা পয়সায় একটি কাজের লোক পেলে কে আর তাকে মুক্তি দিতে চায়? মেয়েরা যে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক এবং তাদের যে সর্বদাই পায়ের নীচেয় রাখা উচিত এই মূল্যবান কথাটি কখনও আমার মাথায় ঢোকানো হয়নি। নিজের সম্বন্ধে এত কথা বলার একটি বিশেষ কারণ আছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষমানুষ হয়ে জন্মানো সত্ত্বেও মহিলাদের সম্বন্ধে আমার মনোভাব কিছুটা স্বতন্ত্র। সালটা বোধহয় ১৯৯৮। দীপা মেহেতা পরিচালিত 'ফায়ার' ছবিটি দেশের বিভিন্ন হলে মুক্তি পেয়েছে। নারী সমকামিতা বিষয়ে প্রথম ছবি। দেশের সর্বত্র বিতর্কের ঝড় উঠেছে। নীতিবাগীশেরা সমাজ রসাতলে গেল বলে রব তুলেছে। এবং আমিও পরিচিত লোকজনদের মাঝে নারী স্বাধীনতার স্বপক্ষে গলা ফাটাচ্ছি। প্রচার মাধ্যমগুলি স্বভাবতই এই বিতর্ককে কাজে লাগিয়ে বিক্রি বাড়াবার চেষ্টায় আছে। এই সময় কোন একটি কাগজে 'স্যাফো' সম্পর্কে একটি লেখা প্রকাশিত হয়। সেই লেখায় e-mail ঠিকানা দেওয়া ছিল। সেই ঠিকানায় আমি একটি চিঠি পাঠাই। এবং খুব দ্রুত গোটা ব্যাপারটা ভুলে যাই। এর কিছুদিন পরে এক শীতের সকালে স্যাফোর জনৈক সদস্য আমাকে ফোন করলেন। ব্রিটিশ কাউন্সিলের সহযোগিতায় 'স্যাফো'একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে, আমি এলে সবাই খুশি হবেন। দ্রুত স্নান-খাওয়া সেরে রওনা হলাম। বাসে যেতে যেতে মনের ভেতর অস্বস্তি হচ্ছিল। কেন এই অস্বস্তি? বোধহয় কোন নতুন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে ভয়। যাই হোক্ অবশেষে পৌঁছান গেল। একঝাঁক হাসিখুশি তরুণী আমাকে স্বাগত জানালেন। অনুষ্ঠান দেখে তো আমি একেবারে মুগ্ধ। সেই শুরু। তারপর অসংখ্যবার দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে। সম্পর্ক ক্রমশ গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়েছে। প্রতিবারই মুগ্ধতাবোধ বেড়েছে। আর মনে হয়েছে একটা কথা। কেন এই সুন্দর মানুষেরা এতো বড় পৃথিবীতে নিজের মতো করে বাঁচতে পারবে না? এঁরা তো কারোর কোন ক্ষতি করেনি। বরং সাধ্যমতো মানুষের ভালো করার চেষ্টা করে চলেছেন। তবে কেন এঁদের লুকিয়ে থাকতে হবে? আমরা কি আর একটু উদার হতে পারিনা? আমার সঙ্গে একজন মানুষের জীবনদর্শনে অমিল থাকতেই পারে। তাই বলে আমি তাকে বিকৃত বলবো কেন? আমার গায়ে জোর বেশী, তাই? তাহলে আমার সঙ্গে কোন স্বৈরাচারী শাসকের পার্থক্য কোথায়? আসলে সমাজটা তো পুরুষতান্ত্রিক, তাই এতো সমস্যা। মেয়েরা যখন আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে নিজেদের মতো করে বাঁচতে চাইছে, তখন সব অর্থেই দুর্বল বাঙালী পুরুষের উদ্বেগ সহজবোধ্য। সর্বত্রই নতজানু হয়ে থেকে কেবল বাড়ীর মহিলার উপর তর্জন গর্জন করে নিজেকে পুরুষ মানুষ হিসাবে প্রমান করতে হতো। এবারে সেটাও গেল। কিন্তু একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না - সমাজের অর্ধেক অংশ নারী। সেই নারীদের দুর্বল করে রাখলে পুরুষরাও দুর্বল হয়ে পড়বেন। তার চেয়ে আসুন না সবাই মিলে পাশাপাশি হেঁটে যাই। দেখবেন, বাঁচাটা ভারী উপভোগ্য হয়ে উঠবে। 'স্যাফো'-কে প্রায় জন্মলগ্ন থেকে চিনি। তাই এর কাজকর্ম সম্পর্কে কিছু কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি।

যে কোন সংস্থার সাফল্যের জন্য চাই পেশাদারী চিন্তাভাবনা এবং দুরদৃষ্টি। আশাকরি কর্তৃপক্ষ এ-ব্যাপারে অবগত আছেন। একটা কথা এ-ব্যাপারে বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে 'স্যাফো' যেন কেবলমাত্র কোলকাতাকেন্দ্রিক না হয়ে পড়ে। অতিসম্প্রতি বনগাঁয় দুটি মেয়ে আত্মহত্যা করেছে। তাদের কাছে কোথাও কোন আসার আলো ছিল না। অথচ কোলকাতা থেকে বনগাঁ এমন কিছু দূর নয়। কিন্তু স্যাফো সেখানে পৌঁছতে পারেনি। আমি আশা করবো আগামী একবছরে এই সংস্থা প্রতিটি জেলা সদরে পৌঁছতে সক্ষম হবে। জানি কাজটা সহজ নয়। দূর থেকে কোন অবাস্তব পরামর্শ দেবার ইচ্ছেও আমার নেই। কিন্তু স্যাফোর কিছু সদস্যকে ব্যক্তিগত ভাবে চেনার সুবাদে এ ভরসা আছে যে তাঁরা পারবেন। সংস্থার পক্ষে আর্থিক ভাবে স্বাবলম্বী হওয়াটা একান্ত জরুরী। কেননা প্রতিটি পদক্ষেপেই অর্থের প্রয়োজন। আবারও সেই পেশাদারী দৃষ্টিভঙ্গীর কথা আসছে। এব্যাপারে কোলকাতায় যে সমস্ত বিদেশী দূতাবসের শাখা আছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে। বিশেষ করে মার্কিন কনসাল জেনারেল ও তাঁর স্ত্রী নানা সামাজিক কাজের সাথে নিজেদের জড়িয়ে রেখেছেন। 'স্যাফো'র কোন অনুষ্ঠানে এঁরা উপস্থিত হলে সংস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা বহুগুন বেড়ে যাবে। আরও একটি কথা মনে করিয়ে দিতে চাই। দ্বিতীয় সারির নেতৃত্ব যেন তৈরী থাকে। অল্প কিছু মানুষের উপর নির্ভরশীলতা সংস্থার পক্ষে বিপদজনক। 'স্যাফো'র প্রতিটি সদস্য যেন আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হন। কারণ স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটতে গেলে আর্থিক স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজন। নিজেদের শক্তি ক্রমাগত বাড়িয়ে যেতে হবে, যাতেএকসময় সমাজ নড়েচড়ে বসতে বাধ্য হয়। অন্যরাজ্যে এবং অন্যদেশের এই ধরণের সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। এ প্রসঙ্গে আমেরিকার 'ত্রিকোন' বলে একটি সংস্থার নাম মনে পড়ছে। একথা আদৌ ভাববেন না যে আমি উঁচু বেদিতে বসে দাড়ি নেড়ে বড়ো বড়ো উপদেশ দিচ্ছি। খুব কাছ থেকে দেখে আসছি কি ভীষণ সংগ্রামের ভিতর দিয়ে 'স্যাফো' এগিয়ে চলেছে। তাই একথা দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি যে 'স্যাফো'-র জয় অনিবার্য। এই লেখা শেষ করবো Herbert Spencer-এর কটি লাইন দিয়ে — "No one can be perfectly free until all are free; no one can be perfectly moral until all are moral; no one can be perfectly happy till all are happy."

■ *চিন্ময় ভট্টাচার্য্য — সরকারী চাকরী করেন, এবং স্যাফো ফর ইক্যুয়ালিটির বন্ধু*

নারী-জন্ম
তসলিমা নাসরিন

তাদের জন্য আমার করুণা হয় যারা নারী নয়
দুর্ভাগাদের জন্য আমার দুঃখ হয়, যারা নারী নয়।
অবিশ্বাস্য এই শিল্প, অতুলনীয় শিল্প এই নারী, বিশ্বের বিস্ময়, বিচিত্রিতা।
আমি নারী, বারবার চাই, শতবার চাই নারী হতে, নারী হয়ে জন্ম নিতে। সহস্র জন্ম চাই
আমি, নারী জন্ম চাই। নারীর প্রেম চাই, তার কামরসে স্নান চাই, মৈথুন চাই।
মৈথুনে মোহাচ্ছন্ন হতে হতে মরিয়া হয়ে চাই একটি শিশু, আমার তীব্র প্রচন্ড চাওয়া তীব্রতর
হতে থাকে যতক্ষণ না আমার নারী-শরীরটিই শুক্রাণুর জন্ম দিচ্ছে।
একটি ভ্রূণ আমার জরায়ুতে।
নারী-শিশু জন্ম দেব আমি, আমি নারী, জন্ম দেব নারী-শিশু।
আমি ভালবাসছি সর্বদর্শী সর্বময়ী সর্বব্যাপিনী শাশ্বতী নারীশক্তি। ভালবাসছি নারীশিশু,
কিশোরী, তরুণী, যুবতী, বৃদ্ধা। হিরন্ময়ী ইচ্ছাময়ী প্রাণবতী হৃদয়বতী আবর্তিত
হতে হতে বিবর্তিতহতে হতে সম্রাজ্ঞী হতে হতে গোটা ব্রহ্মান্ডের ঈশ্বরী হচ্ছে।
ভালবাসছি আমাকে!
নারীকে।
নারী-জন্মকে।

চক্র
রমা ঘোষ

তোমার চোখের কূলে ইচ্ছে হয় বসে থাকি চুপ
চোখ যে সাগরদিঘি কে জানত না দেখে ও-রূপ
ডিঙিনৌকা ভাসমান, চেরাসিঁথি ঝাউবনবীথি,
কাঁধের সুভাঁজ ভেঙে খোলাচুল ঝুলন্ত বাগান।

তুমি কি ভোরের দেবী! শুকতারা কপালে সাজানো।
তমসা উত্তীর্ণ দিন শুরু হল, ভাঙা কলসের
টুকরো কুড়িয়ে নয় সময়ের বৃথা অপচয়,
কুলালের চক্র ঘোরে — ফিরে পাই মৃত্তিকাতৈজস।
উনুন সাজিয়ে ফের ভাত রাঁধি, নতুন হাঁড়ির
কান্না উপচে ঝরে পড়া ফেনগন্ধে ফিরে আসে খিদে।

মাঝে মাঝে দেখা দিও, ঢলে পড়লে ঠেলে দিও মাথা,
শীতে হিমাক্ত দাঁতে কাটা ত্বক অলিভের স্নেহে
ভরে দিও, হেসে উঠো জবুথবু বধির পাহাড়ে,
তোমার চোখের কোলে পথক্লান্ত চায় অন্নভোগ।

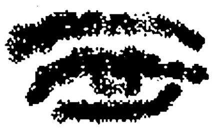

A Country that must be Travelled Alone
Shalini Mahajan

backpack on shoulders
the weight of books
balanced precariously inside my head

the maps are generally misleading
too many directions pointed at
too many journeys indicated

and each traveller must find her own path
trails close behind each woman into the wilderness

they have left records
but the branches have closed in

so I hack my own
with my meagre inadequate instruments

please refrain from giving directions.

The Critters of the Sleeping Mind
Shalini Mahajan

The critters of the sleeping mind
Jumbling the passageways
To create connection where none was before
Where none may be after

Frissons highway along with no consideration
To mind manners or materiality

I am learning to blunt my fingertips to edges
The casting nets are wide
I am not a slippery customer
Only a fading bag

Colossal gapes from around
Rudderless floundering
We create no sound as we slide out
Seamless

Friezes of memory will hold the skin together
Wisdom speaks with much head shaking
Countenances drop
Are left to melt everywhere

Make a bread crust of me
Warm tough chewy
I will be fragrant at last

Kiss the cook
Shed the table of stained cloth
Polish the forks before you replace them
Recycle life in conversations
And then regale recant regurgitate

Customs that pull through
Not unlike the dentist's chair

A single petal can hold a tear drop fragrance

Leave the rest to food and fraudulent flatulence

মন ওঠো
তসলিমা নাসরিন

মন তুমি ওঠো, ওঠো তুমি, তুমি ওঠো মন,
মন মন মন ওঠো মন ওঠো মন তুমি ওঠো ওঠো মন
মন ওঠো তুমি
ওঠো তুমি মন
মন মন মন
ওঠো, লক্ষ্মী মন, তুমি ওঠো এবার,
ওঠো ওই পুরুষ থেকে, মন ওঠো,
ওঠো তুমি, শেকল ছিঁড়ে ওঠো, ভালবাসার শক্ত শেকলটা ছিঁড়ে এখন ওঠো
তুমি তোমার মত করে কথা বলো,
তুমি তোমার মত তাকাও
তোমার মত হাসো
আনন্দ তোমার মত করে করো। দুঃখ তোমার মত করো।

মন তুমি ওঠো, যতক্ষণ তুমি ওই পথে, পথিকে, ওই পতিতে, ওই পুরুষে,
পুরুষের পদাঙ্কে, পদাশ্রয়ে, ওই পাতে, পতনে,
যতক্ষণ তুমি পরজীবী, তুমি পরোপজীবী, যতক্ষণ পরায়ত্ত, পরাহত,
ততক্ষণ তুমি তুমি নও।
যতক্ষণ প্রণত, প্রচ্ছন্ন, ততক্ষণ তুমি প্রফুল্ল নও, প্রবল প্রখর নও, প্রতাপান্বিত নও
ওঠো, পরিত্রাণ পেতে ওঠো, প্রাণ পেতে ওঠো।
মন ওঠো মেয়ে, ও মেয়ে, ওঠো,
পুনর্জন্ম হোক, পুনরুত্থান হোক তোমার।

হৃদয়ে কখনও এমন আস্ত একটি পুরুষ পুরে রেখো না,
পুরুষ যখন ঢোকে, একা ঢোকে না, গোটা পুরুষতন্ত্র ঢোকে।
এই তন্ত্রের মগজ-মন্ত্রে মুগ্ধ হবে, প্রেমে প্রলুব্ধ হবে, মৃত্যু হবে তোমার তোমার।
ও মন তুমি ওঠো, নাচো, তোমার মত, তোমার মত করে বাঁচো।

প্রান্তিকতার রাজনীতি - অর্থনীতি

অনিতা অগ্নিহোত্রী

কারা প্রান্তিক? কারাই বা মূলধারার?

গত তিন বছরে আমাদের সমাজ সংযোগ চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কাজ করতে করতে অসংখ্যবার 'প্রান্তিক' কথাটির মুখোমুখি হয়েছি। কিন্তু অবস্থানের প্রান্তিকতা যেহেতু বহুমাত্রিক, বহুস্তরীয় এবং তার নানা দৃশ্যমান ব্যঞ্জনা, প্রান্তিক মানুষের কণ্ঠস্বর নিয়ে কাজ করাও নানা সূক্ষ্ম জটিলতায় আক্রান্ত। হতদরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের কর্মহীন যুবক তার 'হাড়ী' প্রেমিকাকে নিয়ে ট্রেনলাইনে গলা দিলে পুত্রহারা জননী নিষ্ঠুর, উন্মাদ কুলগর্বে বলে ওঠেন : কি করে ওকে ঘরের বউ করতাম, ও যে অচ্ছুতের মেয়ে, আমার ঘরে মা-কালী আছেন যে! যে নিজে অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিচারে প্রান্তিক, দারিদ্র রেখার তল ঘেঁষে যার নিত্য অবস্থান, সেও জাত-কুলের বিচারে অন্যকে বলে অচ্ছুত!

রক্ত ঘাম কান্নায় গড়া আনন্দহীন জীবনের সামান্য উদ্বৃত্ত প্রাণশক্তি এইভাবে নিজেকে ও অন্যকে কেবলি আক্রমণ করে অস্তিত্বহীন কোনও গর্বের বা ক্ষমতার কল্পনায়।

ক্ষুধার্ত ছেলে মেয়েকে স্কুলে দুপুরের খাবার খেতে দেয় না ক্ষুধার্ততর বাবা মা-রা। রাঁধুনীর জাতকুল নেই বলে। আজকের খবরে আছে এক হতভাগিনী রাধুঁনীকে বিবস্ত্র করে মারবার কথা — তাদের কেন্দ্রে কেন মোটা চালের খিচুড়ি রান্না হয়, ভালো খাবার হয় না - এই দোষে। নিরীহ কিশোরীর মুখে অ্যাসিড ছোঁড়ে সমাজবিরোধীরা কাউকে বিয়ে করতে অস্বীকার করেছিল বলে। আবার একদিন গণপিটুনিতে একই সাথে মারা যায় একাধিক সমাজবিরোধী। যারা সময়ে পালাতে পারেনি, তারা মারা যায়। যেভাবে নারী পাচারকারীদের চক্র পুলিশের অধরা রয়ে যায়, খদ্দেরকে ফুসলোবার দায়ে পথে দাঁড়ানো দেহোপজীবিনিরা বার বার আটক হয় ও জামিন নিয়ে বেরিয়ে আসে।

"মূলধারা" যেন এক আকাশচুম্বী ট্রাপিজের তার। একটু আধটু পা ফসকালেই নিচে অনন্ত প্রান্তিক পৃথিবী। যারা ওই তারে কোনও দিন পা রাখতে পারবেনা, তারা জরাগ্রস্ত সিংহ বাঘ হাতী ও বামন মানুষ।

প্রান্তিকতার আলোচনা আরও এক প্রশ্নে নিয়ে যায় আমাদের : আমরা কি সময়ের সঙ্গে আরও উন্নত ও সভ্য হয়েছি। অবশ্যই বস্তুগত অর্থে নয়, মানুষের প্রতি মানুষের মনোভাবের দৃষ্টিকোন থেকে? হিংস্রতা, অকারণ রক্তপাত কি আগের চেয়ে বেড়েছে? পাঁচশো বছর পিছিয়ে গিয়ে দেখলে তুলনা স্পষ্টতর হবে। রক্তের বন্যায় স্নান, গণহত্যা, লুন্ঠন — বিজয় অভিযানের নামে সভ্যতা উজাড় করে দিয়ে চলে যাওয়া এসবের সঙ্গে কোনও কলঙ্ক জুড়ে থাকতো না তখন। বরং এগুলি ছিল পৌরুষের বা শৌর্যের চিহ্ন। রাজ্যবিস্তারের নামে ষোড়শ শতাব্দী থেকে যা ঘটছে, তারই পুনরাবৃত্তি আমরা দেখেছি বিশ্বযুদ্ধের মারণযজ্ঞে। জাতীয়তাবাদের দাবী কোনও বিজয়পিপাসু সম্রাটের রক্তপিপাসার চেয়ে কম নয়। যুদ্ধে প্রত্যক্ষ হত্যা ও আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে থাকে বন্দী পীড়ণ ও পরাভূত দেশের মানুষের প্রতি জিঘাংসা।

আশ্চর্য, অথচ আশ্চর্য নয়, যে, আইন ও মানবাধিকারের প্রসার ও উন্নততর ব্যাখ্যার পাশাপাশি চলে সন্ত্রাস ও যুদ্ধ, যার মূলে থাকে জাতি বা সম্প্রদায়ের শক্তি প্রতিষ্ঠার স্পষ্ট অভিলাষ। ইরাক বা আফগানিস্তান এই গত কালকের কথা। যুদ্ধ বা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের মধ্যে নিক্ষিপ্ত সমাজের সমস্যা একরকম। আরও একরকম সমস্যা স্বাভাবিক সমাজের 'রক্ষণাবেক্ষণে' আবদ্ধ ব্যক্তির। পশ্চিম দুনিয়ায় এবং প্রাচ্যের উন্নততর দেশগুলিতে ব্যক্তির স্বাধিকারের ক্ষেত্র অন্ততঃ আইনের চোখে বিস্তৃততর হয়েছে, আইন সমাজকে নিযুক্ত করেছে ব্যক্তির স্বাধিকার রক্ষায়। বলাই বাহুল্য যে, আইনের কার্যক্ষমতা যত বৃদ্ধি পাবে, আইনবহির্ভূত কার্যকলাপে লিপ্ত সমাজের অভিভাবকত্বের সীমানা ততই খণ্ডিত হতে থাকবে।

ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে ব্যক্তিমানুষের অবস্থানের চেহারাটি কি রকম? গত দু'দশকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি প্রকৃতি বদলেছে। যদিও এখনও জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ হতদরিদ্র ও নিরন্নের সন্তান বিক্রীর সংবাদও দুর্লভ নয়, তবুও স্বীকার করতে হবে, গতি ও বৈচিত্র্য কেবল শহরাঞ্চলে, শিল্পপণ্যের বাজারে নয়, এসেছে গ্রামেগঞ্জেও। কৃষি উৎপাদন বিপণন, উন্নত পরিকাঠামো, টেলি পরিষেবা ও অন্যান্য যোগাযোগ প্রযুক্তির বিস্তারে। সমাজের প্রকৃতি কি বদলেছে? একশো বছর আগে সমাজ ছিল অভিভাবক। আচার ব্যবহার, বেশভূষা, রীতিনীতির সংরক্ষণে সমাজ তার সমাজপতিদের নিক্ষেপ করতেন বিদ্রোহী ব্যক্তিমানুষের দিকে।

সমাজের এই অভিভাবক মূর্তি আজ আর নেই। অন্ততঃ শহরাঞ্চলে এবং উন্নততর মফস্বল ও গ্রামে। নেই কারণ সমাজ তার প্রতিপালকের ভূমিকা পালন করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। স্বামীনিগৃহীত স্ত্রী অথবা সন্তান বিতাড়িত বাবা মায়ের সংরক্ষণ বা পুনর্বাসন করতে এই সমাজ সক্ষম নয়। অর্থাৎ যেখানে ব্যক্তির সাহায্যে আইন এগিয়ে আসবেনা সেখানে সমাজও মৌন থাকবে। অথচ, প্রতিপালন ও সহায়তায় অক্ষম এই সমাজ কিন্তু তার শাসকের মূর্তি একেবারেই ছাড়তে প্রস্তুত নয়। বরং যতদূর সম্ভব সংখ্যাগুরু গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অদ্বৈত হয়ে ব্যক্তিকে সে ঐকমত্যের শিক্ষা দিতেই সচেষ্ট হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে সমাজ ও সমাজ কর্তাদের সংগে মিলে মিশে এক হয়ে যায় সংঘ, প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল তার স্থানীয় কমিটি... যেক্ষেত্রে যার প্রয়োজন বা গ্রহণযোগ্যতা বেশি। নানা রঙের মিশ্রণে শাসনের আসল রং বা তার জাত চেনা কঠিন হয়ে ওঠে। Conform যে করতে পারে না, যার কণ্ঠ বেসুরে বাজে, চিহ্নিত বা অচিহ্নিত পদ্ধতিতে সে হয়ে যায় প্রান্তিক। এই প্রান্তিকতার চরিত্র তাই শাসকের চরিত্রের মতন পরিবর্তনশীল, এবং অবশ্যই তার সংগ্রামের ইতিহাস লেখার জন্য ইতিহাসবিদ্ যোগাড় করে ওঠা শক্ত, কারণ অন্য সব গোষ্ঠীর মত গণমাধ্যমও তার নিজস্ব শাসনপ্রণালী বজায় রেখেছে। গণমাধ্যমকে একটি স্বতন্ত্র সত্তা বলে ভাবার কোনও কারণ নেই, তা শ্রেণীবিন্যস্ত সমাজের ক্ষমতা-কাঠামোর বিশেষ অভিব্যক্তি মাত্র।

এই শ্রেণীবিভক্ত সমাজের হিসেবে কখনও দরিদ্র, নিরন্ন মানুষ প্রান্তিক। তাদের মধ্যে প্রান্তিকতর মেয়েরা, মেয়েদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছিন্ন, বিতাড়িত এবং পতিহীনেরা। প্রান্তিকতর শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীরা, ক্ষমতাহীন বৃদ্ধ বৃদ্ধারা, অভিভাবকহীন শিশুরা, আদিবাসী উপজাতি ও প্রত্যন্ত বর্ণের মানুষ। শিক্ষিত বিত্তবানের কাছে তুলনায় প্রান্তিক অক্ষরহীন; বন্দুকধারীর কাছে প্রান্তিক নিরস্ত্র। থানার লকআপে প্রান্তিক বন্দী অপরাধী; সন্ত্রাসবাদীর আস্তানায় প্রান্তিক, রক্তঝরা কফিনবন্দী নিহত পুলিশকর্মী। প্রকৃতির হিসেবে যারা নিজেদের স্বাভাবিক মনে করেন, মানবমানবীর সেই বৃহৎ সমাজে প্রান্তিক সমকামী লিঙ্গান্তরিত ও লিঙ্গ-অনির্নিতেরা। অথচ দুর্নীতিপরায়ণ ধনী, অপরাধী রাজনীতিক, ক্ষমতাবাণিজ্যকারী দালালেরা কখনও প্রান্তিক হন না। সমাজ যদি 'বিকৃতি' বা 'বিচ্যুতি'র বিরোধিতাকে নিজের কর্তব্য বলে মনে করে, তবে কু-অর্থনীতি ও আইন বিরোধিতার অপরাধীরা সমাজবহির্ভূত হ'ন না কেন? ঐকমত্যের রাজনীতি যাঁরা করতে পারেন না, তাঁদের জন্য একটি বড় আশংকা হল কেবল সমাজবিচ্ছিন্ন, একক নয়, অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষমতাহীণ বেঁচে থাকার পরিণতি। অঘোষিত আইনের বলে এঁদের জীবন ও জীবিকার শিকড় থেকে উন্মূলিত করে দেবার সংঘবদ্ধ চেষ্টা।

আমরা এখন যেখানে সাহায্যের হাত বাড়াতে পারি তা হ'ল প্রান্তিক অস্তিত্বের একটি নেটওয়ার্ক - সমবায় সঙ্ঘের মত বিচ্ছিন্ন মানুষদের নিয়ে স্বতন্ত্র সমাজ রচনা। এ রচনার গোড়ায় যে ব্রাহ্মণ জননীর কথা বলেছি, যিনি কুলের গর্বে আত্মহননে বাধা দেননি হাড়ী-পুত্রবধূকে, তাঁর আত্ম অন্ধতার থেকে বেরিয়ে আসা দরকার আমাদের। আমরা সকলেই প্রান্তিক। কোনও না কোনও অর্থে। অথচ বিশেষ বিশেষ অবস্থায় নিজেকে উন্নততর কল্পনা করে আমরা অন্যের চেয়ে দূর রাখি নিজেকে, অথবা নিজেকে মনে করি নৈতিকতায় সেরা। একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী, পিতৃপরিচয়হীন সন্তানের মা, একজন সমকামী বা লিঙ্গ-অনির্নিত মানুষ নিজেদের লড়াই আলাদা ভাবে করেও একটি সমবায়সূত্রে মিলিত হতে পারেন; কারণ প্রতিপক্ষ সবারই এক : সংগঠিত সংখ্যাগুরুর রাজনীতি-অর্থনীতি।

■ *অনিতা অগ্নিহোত্রী — কবি, ছোটগল্পকার ও ঔপন্যাসিক*

(৩ পাতার পর)

আলোছায়ার সীমানায়

বদল হয়েছে তাঁর অর্থনীতি সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিও। 'শিকাগো স্কুল' বিখ্যাত মানুষের সমস্ত আচরণে স্বার্থের অনুসন্ধানের জন্য বিয়ে থেকে সন্তান জন্ম, এমনকী অপরাধ — সবই স্বার্থপর মানুষরা মূল্য এবং প্রাপ্তির তুল্যমূল্য নিরিখে বিচার করে সংঘটিত করে — বলছে এই ধারা। এই প্রকরণে বিশ্বাসী হয়েও ডোনাল্ড অর্থনীতির পঠন-পাঠন-প্রকরণে বহু সময়, তাঁর মতে গণিতে অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। ডোনাল্ড পরিচিতিতেই নারীবাদী অর্থনীতিবিদদের সংগঠন এবং তার মুখপত্র 'ফেমিনিস্ট ইকনমিস্ট'-এর সম্পাদকমণ্ডলিতে থেকেছেন। এখনও তিনি খোলাবাজারের পক্ষে, কিন্তু সব কিছুকেই মূল্য-সুবিধার নিরিখে আর মাপতে রাজি নন।

ডেয়র্ড্রের এই রূপান্তর নারীপ্রশ্নে নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। অনেকেরই বক্তব্য, তিনি হয়তো একজন নারী 'হয়ে ওঠার' পাঠ নিয়েছেন, কিন্তু তিনি নারী অর্থনীতিবিদ 'হয়ে ওঠেননি'। 'নারী' হয়ে ওঠার আগেই তিনি এক সম্মানিত বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির এক জাঁদরেল পুরুষ অধ্যাপক। শিক্ষা বা কর্মক্ষেত্রে তাঁকে বৈষম্য বা যৌন নির্যাতন সহ্য করতে হয়নি। সন্তানধারণ করতে হয়নি, সন্তানপালন করতে গিয়ে পরিবার আর পেশার দ্বন্দ্বে দীর্ণ হতে হয়নি। কত অজস্র ভাবে নারীর কণ্ঠস্বরকে অহরহ নীরব করে দেওয়া হয়, পেশাগত জীবনের অধিকাংশ সময়ে তাঁকে তার শিকার হতে হয়নি। তবুও যখন তাঁকে আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কলেজ অব বিজনেস'-এর ডিন গ্যারি ফেটখে মজা করে বলেছেন যে এবার যখন তিনি নারী হয়ে গেছেন, তা হলে তাঁর মাইনে কমিয়ে দেওয়া যেতে পারে — তিনি সেই ইয়ার্কি হজম করতে পারেননি। প্রশ্ন উঠেছে, নিজের নারী 'হয়ে ওঠার' প্রক্রিয়ার যে বর্ণনা ডেয়র্ড্রে দিয়েছেন, তা তো সার্বিক নয়, স্থান-কাল-বর্ণ-ধর্ম-সামাজিক অবস্থান প্রভৃতি দিয়ে নির্দিষ্ট। আসলে ওই সীমারেখাটাই তো এক লক্ষ্মণের গণ্ডি। এক স্টিরিওটাইপ। তিনি তো তা হলে একটা থেকে আরেকটা স্টিরিওটাইপের খাঁচায় নিজেকে বন্দি করলেন। তা কি মুক্তি?

স্ত্রী-সন্তান ডেয়র্ড্রে ম্যাকলোকস্কিকে ত্যাগ করেছেন। সমর্থক শুধু বৃদ্ধা মা। তবু এক সাহসী পুরুষের আরেক সাহসিনী নারীতে রূপান্তর আমাদের সময়ের বহু নারী এবং আরও বহু পুরুষকে ভাবাবে।

■ *শাশ্বতী ঘোষ — কলেজে অর্থনীতি পড়ান ও নারী আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত*

'স্বকণ্ঠে' স্যাফোর মুখপত্র নয় বা 'নারী সমকামিতা'র প্রচার পুস্তিকা নয়। আমরা চাই সমকামিতা নিয়ে চারপাশের এই চাপধরা নৈঃশব্দ ভেঙে খান্ খান্ হয়ে যাক। নিষিদ্ধ ব্রাত্য বিষয় নিয়ে চলুক কথার পিঠে কথা — নানা কথা, জানা বা অজানা। অবশ্যই 'স্যাফো'-র সঙ্গে সহমত তার একমাত্র শর্ত হতে পারে না। কখনও বা 'স্যাফো'ও হয়ত একটু ভিন্ন মত পোষণ করে। আমরা স্থির জলে একটা ঢিল ফেলেছি মাত্র — তরঙ্গ উঠছে কি? প্রিয় পাঠক, আপনারাই সবথেকে ভালো বলতে পারেন, তাই না?

আত্ম - 'হত্যা'

একটি স্যাফো প্রতিবেদন

দিনটা ছিল ২৬শে নভেম্বর, ২০০৪ শুক্রবার।

"মা, আমার বাড়ী ফিরতে দেড়টা-দুটো হবে। আজ ড্রাইভিং-এর ফাইনাল টেস্ট। গাড়ী চালিয়ে চাঁদপাড়া অবধি যেতে হবে।" এই বলে অপর্ণা খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে দুধ আর বিস্কুট খেয়ে সাইকেল নিয়ে বাড়ী থেকে বেড়িয়ে যায়।

না — সে আর বাড়ী ফেরেনি।

বাড়ী ফেরেনি কাজলীও। ইতিহাসের কোচিং ক্লাসে গিয়েছিল সকাল বেলায়। বলেছিল সেখান থেকে বইয়ের দোকানে যাবে। বই ঠিকঠাক পেলে আগামীকাল মায়ের থেকে টাকা নিয়ে বই কিনে নিয়ে আসবে সে।

অপর্ণা আর কাজলী। বনগাঁ আর বিভুতিভূষণ হল্ট-এর মাঝামাঝি একটা জায়গায় রেললাইনে তাঁদের খণ্ডিত, নিথর দেহ সনাক্ত করে রেলওয়ে পুলিশ গত নভেম্বরের ২৬ তারিখ।

অপর্ণা — বয়স ২০। বাড়ী হাবড়ার বামীহাটী, কাঁঠালতলা। পড়াশুনা মাধ্যমিক। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা না দিয়ে সে চলে যায় NCC'র ট্রেনিং নিতে। স্বপ্ন ছিল পুলিশে চাকরী। তারই প্রস্তুতি হিসাবে চলতো শরীর চর্চা। রিং ধরে ঝোলা, যাতে আরও আধ ইঞ্চি বেশী লম্বা হওয়া যায়। হলেই পুলিশে চাকরী পাবার জন্য প্রয়োজনীয় উচ্চতা তার হবে।

কাজলী — বয়স ১৬ প্লাস, বাড়ী বনগাঁ, ঘোষপাড়া। এগারো ক্লাসের কলা বিভাগের মেধাবী ছাত্রী।

অপর্ণার মন ভালো ছিল না। গতকাল মানে ২৫শে নভেম্বর ওকে দেখতে আসে বাদুড়িয়া থেকে পাত্রপক্ষ। পছন্দ হয়। তাঁরা বলেন ৩০শে নভেম্বর পাত্রীর বাড়ীর লোকজনেরা যাতে তাদের ঘর-গৃহস্থালী দেখতে আসেন, ছেলের সম্বন্ধে খোঁজ নেন। সবকিছু ঠিক হলে ঐ সময়ে বিয়ের দিন স্থির করা যাবে। অপর্ণার মতামত জনতে চাইলে সে বলে "ছেলের ব্যবসা, চাকরী করা কেউ হলে ভালো, না হলে —"

না, সে বাড়ীর লোকদের সরাসরি না বলেনি। বলতে পারেনি, সাহস জোটাতে পারেনি যাতে সে বলতে পারে যে সে ঐ ছেলেটাকে কেন, কোন ছেলেকেই বিয়ে করতে পারবে না কারণ সে আর একটা মেয়েকে ভালবাসে।

নিম্নবিত্ত ঘরে বেড়ে ওঠা অপর্ণা ছিল খুব হাসিখুশি, চঞ্চল, কিছুটা বুঝিবা অবুঝও। কেউ কটু কথা বললেও তা পুষে রাখার কোন প্রশ্নই ছিল না — অন্ততঃ শ্যামাপদবাবু (কাজলীর বাবা) বহুবার যথেষ্ট রেগে তাঁদের বাড়ী থেকে সেই মুহূর্তে চলে যেতে বলেছেন অপর্ণাকে। সংসারের অনটন থাকলেও লেখাপড়াপ্রিয় শ্যামাপদবাবু তাঁর মেয়েদের পড়াশুনার ব্যাপারে সবসময়ে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই দাদুর বাড়ী বেড়াতে আসা অপর্ণার তাঁদের বাড়া সারাদিন থাকা বা তাঁর মেয়ের সাথে শুধু কথা আর কথা (তাঁর ভাষায় গুজগুজ-ফুসফুস) তাঁদের বাড়ীর কেউই ভালো চোখে দেখতে পারেন নি। কিন্তু অপর্ণাকে তাড়িয়ে দিলেও পরের দিনই অবার হাসি হাসি মুখ করে সে হাজির হতো কাজলীর বাড়ীতে। হাবড়া থেকে জ্যেঠিমা বা মা বাড়ী ফেরার কথা বললেই সে ছুতো দিতো — "দাদু-দিদা বুড়ো মানুষ। তাদের কাছে আর কটা দিন থেকে যাই।" ভাদ্র এভাবেই কাটে। আশ্বিনের বানভাসি বন্যায় সারা বনগাঁ ভেসে গেলেও অপর্ণা-কাজলীর কাছে তা ঈশ্বরের আশীর্বাদ। আরও একটা মাস প্রকৃতি তাদের সুযোগ করে দেয় পাশাপাশি থাকার। একদিন না একদিন তো ছুটির মেয়াদও ফুরায়। অপর্ণাকে ফিরে আসতে হয় কার্তিকে। তার বাড়ীতে। হাবড়ায়।

কিন্তু তার 'কাজুলী'কে ছেড়ে সে থাকে কি করে? অথচ কেমন করে সে তাকে নিজের কাছে রাখতে পারবে? এদিকে বিয়ের তোড়জোড় — না, বুকের ভিতর পাথর হয়ে চেপে বসে থাকা কষ্ট বয়ে বয়ে সে বড় ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলো — নিজের সাথে যুদ্ধ করতে করতে সে বড় ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল — মাথা কোনভাবেই কাজ করছিল না। তবে কি 'মৃত্যু'ই পারে তাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে? 'মৃত্যু'ই তাদের মিলাতে পারে 'পরপারে'?? সে আর ভাবতে চায় না। হাবড়া থেকে সোজা চলে আসে বনগাঁ —

"তোর মার শরীর খুব খারাপ, তুই আমার সাথে চল" — ইতিহাসের কোচিং ক্লাসে ঢুকে একথা বলতে প্রথমে মাস্টারমশাই অপর্ণার কথায় কাজলীকে ছাড়তে না চাইলেও পরে যেতে বলেন। এরপর?

শোনা যায় ওরা নাকি সাড়ে আটটা - পৌনে নটা নাগাদ জি.আর.পি মর্গে এসে উঁকি মেরে দেখেছিল (প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান অনুযায়ী) এবং তাদের এখানে কি করছে জিজ্ঞাসা করলে অপর্ণা হাসতে হাসতে উত্তর দেয় — "এই তো, একটু দেখছি" — তারপর রেললাইন ধরে শুধু হাঁটা আর হাঁটা।

বনগাঁ আর বিভূতিভূষণ হল্ট-এর মাঝামাঝি একটা জায়গায় রেললাইনের ধারে বাবলা গাছের নীচে বসে ওরা স্টেশন চত্বর থেকে কিনে আনা জলের বোতল থেকে জল খায়। লজেন্স খায়। আর হ্যাঁ — ২২টা Alprax .5 mg-র খালি স্ট্রীপ পাওয়া যায় সেই বাবলা গাছের নীচে। এরপর তাদের যাত্রা 'মহাপ্রস্থানের পথে ...' সকাল ন'টা চল্লিশের বনগাঁ-প্রিন্সেপঘাট লোকাল কাছে এগিয়ে আসতেই ...!!! স্থানীয় মানুষেরা কাছে গিয়ে দেখেন একজনের খণ্ডিত দেহ আর অন্যজনের নিথর দেহ বুঝিবা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে।

পরের দিন সেই গাছের আশে পাশের ঘাসজমিতে পাওয়া যায় একটা না-শেষ হওয়া 'সুইসাইড নোট' — "মা আমার তুমি ক্ষমা করো। আমি কাপুরুশের মতো পালিয়ে গেলাম কিন্তু কি করবো মা আমি যে কাজুলীকে খুব ভালবাসি ওকে ছেড়ে আমি থাকতে পারবো না। এমন কি ও আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না তাই আমরা দুই জনে মৃত্যু পথ বেছে নিলাম।

আমাদের মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।

ইতি
অপর্ণা ও
কাজলী

আমাদের একটাই অনুরোধ আমাদের ভালবাসার দাবী হিসাবে একটাই অনুরোধ আমাদের দুইজনকে একই শশ্মানে দাহ করবে এই আমাদের শেষ ইচ্ছা এই আমাদের শেষ ইচ্ছা এটাকে"

না, কেউ কথা রাখে না — কেউ কথা রাখে নি।

অপর্ণাকে দাহ করা হয় ব্যারাকপুরে আর কাজলীকে বনগাঁ সাতভাই কালীতলা সংলগ্ন শ্মশানে।

আমরা কৃতজ্ঞ নিলয়দার কাছে। গভীরভাবে কৃতজ্ঞ বনগাঁ মহকুমা প্রশাসনের কাছে।

আমাদের কথা
আমাদের কলমে

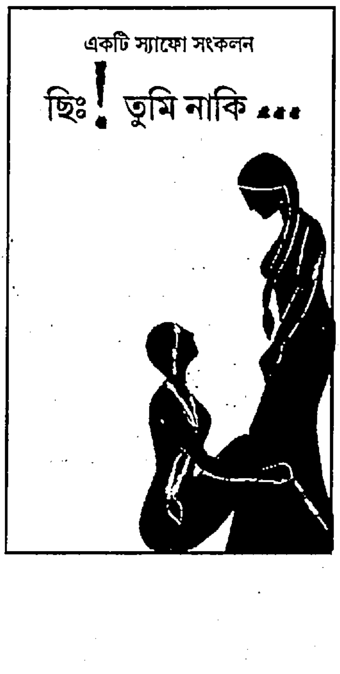

বাংলা ভাষায় প্রথম প্রয়াস
সপ্তর্ষি প্রকাশন (9830371467)
পাওয়া যাচ্ছে কলকাতা বইমেলা ২০০৫-এর ৩৬০ নং স্টলে

Address : c/o A.N. Post Box No. EC 35 Kolkata 700 010
Helpline : 2281 3462 Mondays 1- 3 p.m.; 98315 18320 (10 a.m. - 9 p.m.)

E-mail : sappho1999@rediffmail.com
Website : http://sappho.shoe.org

This Publication is supported by *Sappho for Equality*